২২ অগস্ট ১৯৯০ □ আনন্দবাজার প্রকাশন □ সাত টাকা

আনন্দমেলা

- অজিতকৃষ্ণ বসুর ম্যাজিকের গল্প
- সমরজিৎ করের কল্পবিজ্ঞান উপন্যাস
- কেরিয়ার গাইড
- বেসিকের শেষ ধাপ
- সমরেশ মজুমদারের নতুন ধারাবাহিক উপন্যাস 'কালাপাহাড়'

- টেস্টে 'ট্রিপল সেঞ্চুরিয়ান'-দের ছবি
- গ্রাহাম গুচকে নিয়ে দুর্দান্ত লেখা

দোনাদোনি-র রঙিন পোস্টার

ম্যাজিক! ম্যাজিক!!

- করাত দিয়ে মানুষ কাটার রহস্য
- মঞ্চ থেকে মোটরগাড়ি কীভাবে উধাও হয়ে যায়
- মানুষ কীভাবে শূন্যে ভাসে
- জাদুকর গণপতি, পি· সি· সরকার, হুডিনি ও গোগিয়া পাশার খ্যাতি কেন দেশে-বিদেশে

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - নীলাচল দা

স্ক্যান করেছেন - নীলাচল দা

এডিট করেছেন - অপ্তিমাস

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রপত্রিকার বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান কিংবা আপনি স্ক্যান করে দিতে চান তাহলে শীঘ্রই নিচের ইমেল এ যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

optifmcybertron@gmail.com

● শান্তিপুরী ● ধনেখালি ● বেগমপুরী
● সিল্ক টাঙ্গাইল ● জামদানী ● বালুচরী
● পলিকট শাড়ি ● পলিয়েস্টার স্যুটিং-শার্টিং
● ড্রেস মেটিরিয়াল এবং রেডিমেড
তন্তুশ্রী
বাংলার তাঁত — বাংলার শাড়ি

সূচীপত্র

৫ ভাদ্র ১৩৯৭ □ ২২ অগস্ট ১৯৯০ □ ১৬ বর্ষ ১০ সংখ্যা

আনন্দমেলা

■ সম্পূর্ণ উপন্যাস (শেষাংশ) ■
ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা সমরজিৎ কর ৬২
■ গল্প ■
অবিস্মরণীয় অজিতকৃষ্ণ বসু (অ· কৃ· ব·) ২৬
আকালের ভূত বাণীব্রত চক্রবর্তী ৫৬
■ প্রচ্ছদকাহিনী ■
ম্যাজিক ! ম্যাজিক !! অদ্রীশ বিশ্বাস ১০
পি· সি· সরকার (জুনিয়ার)-এর সাক্ষাৎকার ১৬
ম্যাজিক ও ম্যাজিশিয়ান দীপক রায় ২৩
■ ধারাবাহিক উপন্যাস ■
কালাপাহাড় সমরেশ মজুমদার ৩২
সোনার গণপতি হিরের চোখ ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় ৭৫
■ কমিক্স ■
টারজান ৩১, রোভার্সের রয় ৩৯, গাবলু ৫৪, টিনটিন ৭১, ব্যাটম্যান ৭৩
■ টাকাকড়ি ■
মৌর্যোত্তর উত্তর ভারতের মুদ্রা ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৩০
■ প্রযুক্তিবিজ্ঞান ■
বেসিকের শেষ ধাপ অসীমরতন ঘোষ ৬
■ কবিতা ■
বাদল মেঘের গান পরেশ সরকার ৭৬
■ কেরিয়ার গাইড ■
স্কুল অব প্ল্যানিং অ্যাণ্ড আর্কিটেকচার অমর দাশ ২৮
■ খেলাধুলো ■
এতদিনে গুচ পেলেন প্রাপ্য সম্মান বিকাশ চক্রবর্তী ৪৪
ওভালে অবিস্মরণীয় দুটি নাম···সুব্রত সরকার ৪৭
সম্ভাবনাময় ফুটবলারদের···তানাজি সেনগুপ্ত ৪৮
নতুন কোচ গাসকোয়েনকে···সব্যসাচী সরকার ৫০
একটি অটোগ্রাফের গল্প অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ৫১
মারাদোনার বিদায়ে বিশ্বফুটবল···কৃশানু ভট্টাচার্য ৫২
রঙিন পোস্টার : রবার্তো দোনাদোনি ৪১
■ নিয়মিত বিভাগ ■
চিঠিচাপাটি ৫, বিজ্ঞান : যেখানে যা হচ্ছে ৩৭, কিওকুশিন ক্যারাটের ক্লাস ৫৫, আঁকিবুকি ৬০, হাসিখুশি ৬০, ক্যাম্পাস ৬১, শব্দসন্ধান ৭০, কুইজ ৭৮, বইয়ের খবর ৮১, নানারকম ৮২

সহকারী সম্পাদক □ দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদকীয় বিভাগ □ সিদ্ধেশ্বরনাথ ভামা, সাধনা মুখোপাধ্যায়, শ্যামলকান্তি দাশ, রতনতনু ঘাটী, বাদল ঘোষ, বিমলকুমার পাল
শিল্প নির্দেশক □ অমিয় ভট্টাচার্য
সহযোগী □ অসিত পাল, প্রবীর সেন

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। অস্থায়ী সম্পাদক অভীক সরকার।
দাম সাত টাকা। বিমান মাশুল ত্রিপুরা ২০ পয়সা উত্তর পূর্ব ভারত ৩০ পয়সা

১০ জাদুকর গণপতি, পি· সি· সরকার, হুডিনি কিংবা গোগিয়া পাশার কথা অনেকেই জানেন। জানেন তাঁদের বিচিত্র সব ম্যাজিকের কথা। এবারের প্রচ্ছদকাহিনীতে ম্যাজিক ও ম্যাজিশিয়ানদের কথা আলোচনা করা হল। প্রাচীন মিশর, ইংল্যাণ্ড, চিলি, চিন ও ভারত ম্যাজিকের চর্চায় কীভাবে সারা পৃথিবীতে সুনাম অর্জন করেছিল, আলোচনা করা হয়েছে তার ইতিহাসও। করাত দিয়ে মানুষ কাটার রহস্য, ইণ্ডিয়ান রোপ ট্রিক বা দড়ির খেলা এবং এ-ধরনের আরও অনেক ম্যাজিকের আলোচনা প্রসঙ্গে এসেছে বিখ্যাত জাদুকরদের কথা। পি· সি· সরকার (জুনিয়ার) এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন ম্যাজিককে কেন ইন্দ্রজাল বলা হয়।

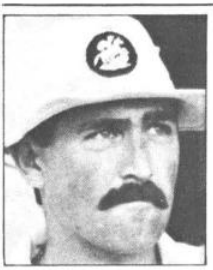

৪৪ গ্রাহাম গুচ বিশ্বের সেরা ব্যাটসম্যানদের অন্যতম। টেস্ট কিংবা একদিনের ক্রিকেট—দু' ধরনের ম্যাচেই তিনি সমান সফল। তবে লর্ডসে সম্প্রতি ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে ৩০০-র বেশি রান এবং পরের ইনিংসে আবার একটি সেঞ্চুরি করে তিনি এক অসাধারণ কীর্তি স্থাপন করেছেন। একটি টেস্টের দু' ইনিংসে ট্রিপল সেঞ্চুরি ও সেঞ্চুরি এর আগে কেউ কখনও করেননি। এদিক থেকে গুচের নাম ক্রিকেটের সর্বকালের মহানায়কদের তালিকায় স্থান পেল। গুচ ও তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে প্রকাশিত হল একটি নিবন্ধ।

৩২ লাল রঙের নতুন মোটর বাইকটাকে জলপাইগুড়ি শহরের অনেকেই চিনে গিয়েছে। মোটর বাইকটা চালাতে খুব আরাম পায় অর্জুন। এই অর্জুন চরিত্রটি যে কোন লেখকের সৃষ্টি, তা পাঠকরা ইতিমধ্যেই জেনে গিয়েছেন। অর্জুনকেই আবার দেখা যাবে সমরেশ মজুমদারের 'কালাপাহাড়' উপন্যাসে। এই সংখ্যা থেকেই ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে।

■ আগামী সংখ্যায় ■

স্বপনকুমার দাসের
প্রচ্ছদকাহিনী
কুমেরুর অভ্যন্তরে

মৃত্যুঞ্জয় মাইতির
সম্পূর্ণ উপন্যাস (প্রথমাংশ)
ইস্কুলের ছুটি

চিত্রা দেবের
ইতিহাসের গল্প
মালাম্মার প্রতিজ্ঞা

খেলাধুলো, কুইজ ও কমিক্স

বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের চাই কমপ্লান

কারণ কমপ্লান ওদের প্রতিদিনের একান্ত প্রয়োজনীয় পুষ্টি যোগায়।

সাধারণত ১৫/১৬ বছর পর্যন্তই ছেলেমেয়েদের বেড়ে ওঠার বয়েস।

প্রোটিন হোল এমন এক পুষ্টিকর উপাদান, যা বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের দৈহিক গঠনে সরাসরি কাজ দেয়। তাই এখন থেকে আপনার ছেলেমেয়েদের জন্যেও চাই কমপ্লান।

কমপ্লান-এ আছে সেরা প্রোটিন অর্থাৎ দুধের প্রোটিন (২০%)। এছাড়া আছে আরো ২২ রকমের একান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্যগুণ।

কমপ্লান বিভিন্ন মুখরোচক স্বাদগন্ধে পাওয়া যায়।

23
সুপরিকল্পিত মাত্রায়,
২৩টি একান্ত
প্রয়োজনীয় খাদ্যগুণ
দুধ মেশানোর প্রয়োজন নেই।

কমপ্লান®

সুপরিকল্পিত সম্পূর্ণ আহার

GX/62/234 BEN

চিঠিচাপাটি

বিশ্বকাপ ফুটবল

আনন্দমেলার গুণগত মান যে অন্যান্য পত্রিকার থেকে কয়েক ধাপ এগিয়ে রয়েছে তা বলতে এখন দ্বিধা নেই।
৩০ মে বিশ্বকাপ ফুটবল সংখ্যাটি পড়ে খুব ভাল লাগল। বিশ্বকাপ ফুটবলে অংশগ্রহণকারী দলগুলির শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় ও তাদের প্রস্তুতিসহ বিগত বিশ্বকাপ ফুটবলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ খুবই আকর্ষক। সিদ্ধার্থ ঘোষের টেবল-টপ ওয়ার্ল্ড কাপ এককথায় অনবদ্য। ১৯৯০-এর বিশ্বকাপে অংশগ্রহণকারী ২৪টি দলের স্ট্রাটেজি, খেলোয়াড়দের বুদ্ধি এবং শারীরিক দক্ষতার বিচারে কোন দল এবার ফিফা কাপ নিজেদের দেশে নিয়ে যাবে তা নিয়ে যখন ফুটবলবিদদের তর্কবিতর্ক জমে উঠেছে সে সময় এই সংখ্যাটির গুরুত্ব খুব বেশি বলে আমার মনে হয়েছে। তানাজি সেনগুপ্তের প্রচ্ছদকাহিনী 'বিশ্বকাপ ফুটবল' খুবই ভাল লাগল। তিনবার বিশ্বকাপ জয়ী ব্রাজিল কি জিতবে ? এই বিষয়ে ব্রাজিলের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়ের লেখা আমাকে খুব আকৃষ্ট করেছে। এজন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ১৯৯০-এর বিশ্বকাপ সম্বন্ধে আমাদের নানা প্রশ্নের উত্তর এই সংখ্যাটি থেকে পেয়ে গেলাম।
ভাস্কর রায়চৌধুরী
মাইথন, ধানবাদ, বিহার

৩০ মে'র বিশ্বকাপ ফুটবল সংখ্যা এককথায় অনন্য। যত্ন করে সংগ্রহ করে রাখার মতো সংখ্যা। দুর্মূল্য এই সংখ্যাটি।
প্রথমেই বলব প্রচ্ছদকাহিনীর কথা। রঙিন ছবিসহ এই লেখাটি পড়ে ভাল লেগেছে। বিশ্বকাপের অতীত এবং বর্তমান নিয়ে অনেক কিছুই জানলাম। কিছু অজানা পরিসংখ্যান নিঃসন্দেহে আমাদের বিশ্বকাপ-জ্ঞান বাড়িয়ে দিল। মারাদোনা, গুলিট, পেলে এবং ইউসেবিও-এর বক্তব্য পড়ে ভাল লাগল।
'বিশ্বকাপ ফুটবল নিয়ে বিভিন্ন প্রতিনিধির লেখাগুলি সত্যিই দারুণ হয়েছে। চব্বিশটি দলের খুঁটিনাটি অনেক কিছুই জানলাম। যদিও কাগজে প্রতিদিন এ-ধরনের লেখা পড়ে আসছি। তাই প্রতিটি দল নিয়েই ওয়াকিবহাল আছি।

কোচেদের বক্তব্য পড়ে ভাল লাগল। 'কারা নজর কাড়বেন' লেখাগুলি বিশ্বকাপ চলাকালীন আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেছে।
শমিত মণ্ডল
রাজহাট, হুগলি

চমকপ্রদ প্রচ্ছদকাহিনী এক দশকের সেরা চমক

'এক দশকের সেরা চমক' প্রচ্ছদকাহিনীটি ১৩ জুন সংখ্যায় পড়লাম। পড়ে অনেক তথ্য জানতে পারলাম। নানারকম বিশ্বরেকর্ডের সঙ্গে চমকপ্রদ নানা ঘটনার কথা লিখেছেন লেখক।
অধীশ বাসু, বালিগঞ্জ প্লেস, কলকাতা-১৯
কৌস্তভ মিশ্র, সাইথিয়া, বীরভূম
সৌরভ দত্ত, বেহালা, কলকাতা-৬১

১৩ জুন সংখ্যায় অভীক মজুমদারের প্রচ্ছদকাহিনী 'এক দশকের সেরা চমক' পড়লাম। লেখাটিতে তিনি একজায়গায় লিখেছেন—পৃথিবীর দ্রুততম ট্রেন টি. জি. ভি. চালু হয়েছে ১৯৮১ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর। ১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বরের আগেই এর গতিবেগ আরও বেড়েছে। এই ট্রেনের গতিবেগ ২৭০ কিমি/ঘণ্টা। কিন্তু ১৮ এপ্রিল সংখ্যায় 'বিজ্ঞান : যেখানে যা হচ্ছে' বিভাগে লেখা হয়েছিল— জার্মান ফেডারেল রেলওয়ের ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস ঘণ্টায় ৪০৬·৯ কিমি বেগে ছুটে দ্রুত গতির রেকর্ড করেছে। এর আগে দ্রুত গতির ট্রেনের নাম ছিল ওই টি. জি. ভি।
তমাল মল্লিক, জোয়েড়া, হুগলি
চিত্রভানু বল্লভ, শ্যামবাজার, কলকাতা-৪

'এক দশকের সেরা চমক' প্রচ্ছদকাহিনী পড়লাম ১৩ জুন সংখ্যায়। পৃথিবীর অনেক সেরা জিনিস সম্বন্ধে জানতে পারলাম। কিন্তু যে মেয়েটি আগুনের ওপর দিয়ে হেঁটেছেন, তাঁর সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত তথ্য জানালে ভাল লাগত। কীভাবে সারা কডিংটন ফালচার ৪৩৮ দিন দৌড়েছিলেন ? তিনি কি দিন-রাতই একটানা দৌড়েছিলেন ?
রাধাশ্যাম মল্লিক, গুসকরা, বর্ধমান

১৩ জুন সংখ্যায় 'এক দশকের সেরা চমক' প্রচ্ছদকাহিনী পড়ে খুব খুশি হতে পারলাম না। লেখাটিতে যেসব ছবি ছাপা হয়েছে তা মূল্যবান এবং চমকপ্রদ
(১) প্রচ্ছদে ছাপা হয়েছে 'এক দশকের সেরা চমক'। কিন্তু লেখা পড়লে মনে হয় কয়েক দশকের সেরা চমক !
(২) প্রচ্ছদে পৃথিবীর বৃহত্তম বাঁধাকপির ছবি এবং সাইকেল ভক্ষণকারী মিশেল লোলিটোর ছবি ছাপা হয়েছে, কিন্তু এদের সম্পর্কে কোনও তথ্য লেখার মধ্যে না পেয়ে কেবল ছবি দেখে মন ভরল না।
পথিক মণ্ডল,
নিউ ব্যারাকপুর,
উত্তর চব্বিশ পরগনা

লেসার শব্দের অর্থ

আমি নবম শ্রেণীর ছাত্র। ২ মে সংখ্যায় 'যান্ত্রিক খেলনা' প্রবন্ধটি পড়লাম। ভীষণ ভাল লাগল। তবে লেখাটি পড়ে একটি কথা জানতে ইচ্ছে করছে। লেখক বলেছেন— 'লেসার বিম ছিটকে বেরোচ্ছে'। এই লেসার বিম সম্পর্কে আমার জানার আগ্রহ ভীষণ। যদি এ-সম্পর্কে জানান ভাল হয়।
প্রমিতপর্ণ পাল
কান্দী, মুর্শিদাবাদ
সম্পাদকীয় উত্তর : লেসার (LASER) শব্দের পুরো অর্থ-হল লাইট অব অ্যামপ্লিফিকেশন বাই স্টিমুলেটেড এমিশন অব রেডিয়েশন। লেসার রশ্মি হল উত্তেজিত ফোটন কণার সমষ্টি।
২০ জানুয়ারি ১৯৮৮ আনন্দমেলায় 'লেসার-যুগ' নামে একটি প্রচ্ছদকাহিনী প্রকাশিত হয়েছিল। আগ্রহী পাঠক ওই সংখ্যাটি পড়ে নিতে পারেন।

বেসিকের শেষ ধাপ

বেসিক ভাষায় প্রোগ্রাম লেখার উন্নত ও শক্তিশালী নানা উপায় সম্পর্কে লিখেছেন **অসীমরতন ঘোষ**

বেসিকের প্রাথমিক নিয়মকানুনগুলি সম্পর্কে আগেই আলোচনা করেছি। একই নির্দেশমালাকে বারবার সম্পন্ন করার জন্য For...Next আবর্তের ব্যবহার করা হয়। আবর্তের মধ্যে এক বা একের বেশি আবর্ত ব্যবহার করে নানা প্রয়োজনীয় কাজ করে ফেলা যায়।

আবর্তের মধ্যে আবর্ত

অনেক সময় একটি আবর্তের মধ্যে আর একটি বা বেশ কয়েকটি আবর্ত রাখা হয়। এদের নেস্টেড লুপ বলা হয়, এরা যেন বড় আবর্তের মধ্যে বাসা বেঁধে আছে। একটা মজার উদাহরণ নিয়ে দেখা যাক :

```
10 FOR I = 1 TO 4
20 FOR J = 1 TO I
30 PRINT J;
40 NEXT J
50 PRINT
60 NEXT I
70 END
```

এই প্রোগ্রামটির প্রথম লাইনের জন্য প্রথমবার আবর্তন করতে গিয়ে I-এর মান এক বলে J-আবর্তটি একবার ঘুরবে ছাপা হবে 1. 40 নম্বর থেকে নিয়ন্ত্রণ চলে যাবে 50 এবং 60 হয়ে 10-এ। এবার I-এর মান দুই বলে J-আবর্তটি দু'বার ঘুরবে। ছাপা হবে 1 2. এইভাবে শেষবার I-এর মান চার বলে J-আবর্তটি চারবার ঘুরবে। এবার ছাপা হবে 1 2 3 4. ফলে পরদায় ছাপা হবে এইভাবে :

```
1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
```

এসো, এবার একটা মজার প্রোগ্রাম লেখা যাক। এখানে আমরা প্রথমে লিখব কাউন্টডাউন কথাটা। তারপরে লিখতে চাই ক্রমশ কমে যেতে থাকা সংখ্যা। সব শেষে START কথাটা লিখতে চাই। প্রোগ্রামটা হবে এইরকম :

```
10 PRINT
   "****COUNTDOWN****"
20 FOR B = 10 TO 1 STEP -1
30 FOR A = 1 TO 400
40 NEXT A
50 PRINT B
60 NEXT B
70 PRINT "****START****"
80 END
```

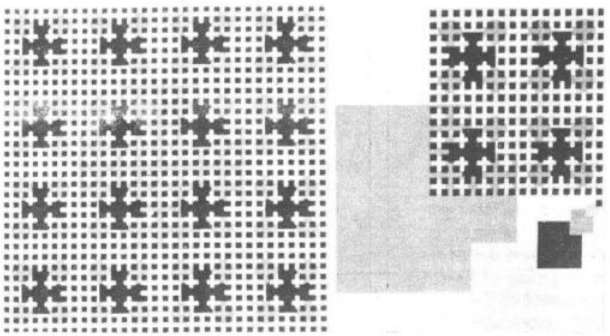

আবর্তের মধ্যে আবর্ত : নানা রঙের বর্গক্ষেত্র আঁকা হয়েছে

প্রোগ্রামে A-আবর্তটি B-আবর্তে বাসা বেঁধেছে। এর কাজ হল ক্রমশ কমতে থাকা সংখ্যাগুলির পরদায় ফুটে ওঠার গতিবেগ কমানো। কারণ B-আবর্তের একবার ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে A-আবর্ত চারশোবার ঘুরবে। এই কাজ করতে সে কিছুটা সময় নেবে। ফলে এক-একটি সংখ্যা পরদায় ফুটে উঠতে কিছুটা সময় পেয়ে যাবে।

পরদায় এভাবে ফুটে উঠবে :

মনে রেখো, বাসা-বাঁধা আবর্তের চলরাশি আর মূল আবর্তের চলরাশি যেন এক না হয়ে যায়। প্রথমটায় পুরো অংশই যেন বড় আবর্তের মধ্যে থাকে। প্রত্যেক আবর্তের জন্য আলাদা-আলাদা FOR আর NEXT বিবৃতি ব্যবহার করতে হবে।

বিন্যাস

তোমার স্কুলে একটা বড়সড় কুইজের আয়োজন করা হয়েছে। প্রত্যেক ক্লাসের প্রত্যেক বিভাগ থেকে একটা করে দল প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে। বিজয়ী দল অন্যান্য স্কুল থেকে এভাবে বাছাই করা দলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবে। প্রত্যেক দলকে যদি বিখ্যাত মনীষীদের নামে নামকরণ করা যায় তা হলে কোন দল কোন স্কুলের তা বোঝা বেশ মুশকিল হয়ে পড়বে। তাই এটা এভাবে লেখা যায় : HINDU (9, 3)—হিন্দু স্কুলের নবম শ্রেণীর 'গ' বিভাগের দল বোঝাতে। তেমনভাবেই হাওড়া জিলা স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর 'ক' বিভাগের দলটিকে HOWRAH (8, 1) বলে বোঝানো যায়। এই পদ্ধতিকে বলে অ্যারে বা বিন্যাস। এই ব্যবস্থায় নামকরণ করলে তা খুব নিয়মমাফিক বলে অনেক তথ্য একসঙ্গে নাড়াচাড়া করতে হলে দারুণ উপকার হয়।

কোনও পৌর এলাকায় তোমার বাড়ি হলে তার নিশ্চয়ই একটা নম্বর আছে : যেমন ৮, বিবেকানন্দ সরণি বা ৫, জীবনানন্দ দাশ স্ট্রিট। পরের রাস্তাটিতে পাঁচটি বাড়ি আছে। এদের বিন্যাসকে HOUSE নাম দিলে এক থেকে পাঁচ নম্বর বাড়িগুলোকে HOUSE (1), HOUSE (2)...HOUSE (5) এইভাবে নামকরণ করা যায়। যদি আমরা HOUSE বিন্যাসটি ওইসব বাড়ির লোকসংখ্যা বোঝাতে ব্যবহার করি, তা হলে এভাবে ওইসব বাড়ির লোকসংখ্যা প্রকাশ করা যায় HOUSE (1) = 5 বা HOUSE (3) = 2. A (3) এই বিন্যাসটিকে পড়তে হবে এইভাবে : এ সাব থ্রি। বন্ধনীর মধ্যে সংখ্যাটি না লিখলে তা

গ্রাফিক্স

কম্পিউটারের পরদা অজস্র আলোর বিন্দু দিয়ে তৈরি। এই বিন্দুদের পিক্সেল (পিকচার এলিমেন্ট) বলা হয়। পার্সোনাল কম্পিউটারে পাশাপাশি ৬৪০ এবং ওপর-নীচে ২০০ বা ৭২০ এবং ৩৫০ পিক্সেল থাকে। আমাদের দেশের প্রচলিত পিসিগুলিতে মাঝারি রেসলিউশনে চারটি রংসহ ৩২০ × ২০০ পিক্সেল এবং উঁচু রেসলিউশনে সাদা ও কালো রং সহ ৬৪০ × ২০০ পিক্সেল থাকে।

মোড : SCREEN O টেক্সট মোড, SCREEN 1 মাঝারি রেসলিউশন গ্রাফিক্স এবং SCREEN 2 উঁচু রেসলিউশন তৈরি করে।

রং : COLOR শব্দটির পর পশ্চাৎপটের রং ও ছবির রং দুটি সংখ্যা লিখে ঠিক করা যায়। যেমন 10 SCREEN 1 : COLOR 7, 0-বিবৃতিটি মারফত সাদা পশ্চাৎপটের ওপরে সবুজ, লাল বা বাদামি রঙের ছবি আঁকার ব্যবস্থা করা যায়।

বিন্দু : PSET শব্দটির পর বন্ধনীর মধ্যে যেখানে আঁকতে হবে তার স্থানাঙ্ক বলে দিতে হয়। সব শেষে বলতে হয় রং-এর সাংকেতিক সংখ্যা। এবার 20 PSET (100, 100), 2 বললে সাদার ওপরে একটা লাল বিন্দু ফুটে উঠবে।

এই বিন্দুটি মুছে ফেলতে চাইলে লিখতে হবে PRESET (100, 100) এতে একই বিন্দুতে আর একটি বিন্দু আঁকা হবে যার রং আর পশ্চাৎপটের রং একই।

রেখা : LINE শব্দটি, এর পর যে বিন্দু থেকে যে বিন্দু পর্যন্ত রেখাটি আঁকতে হবে তাদের স্থানাঙ্ক। এদের মধ্যে একটি বিয়োগ-চিহ্ন থাকে। শেষে কমার পর রঙের সংকেত-সংখ্যা লিখতে হয়। যেমন 30 LINE (20, 30)—(100, 120), 1 লিখলে সাদার ওপর সবুজ একটি রেখা আঁকা হবে।

আয়তক্ষেত্র : LINE বিবৃতির শেষে কমা দিয়ে B অক্ষরটি লিখলে একটি আয়তক্ষেত্র ফুটে উঠবে যার কর্ণটি হবে ওই রেখা। যেমন 40 LINE (20, 30)—(100, 120), 1, B বললে একটি সবুজ রঙের বাক্স পরদায় ফুটে উঠবে।

এর পরে F অক্ষরটি লিখলে বাক্সটি সবুজ রঙে ভরে যাবে : 50 LINE (20, 30)—(100, 120), 1, BF.

বৃত্ত : বৃত্তের কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক এবং এর ব্যাসার্ধের মাপ CIRCLE শব্দটির পরে লিখলে ওই মাপের একটি বৃত্ত ফুটে উঠবে। 60 CIRCLE (150, 150), 30, 3 লিখলে সাদার ওপরে বাদামি রঙের একটি বৃত্ত আঁকা হবে।

একে লাল রঙে ভরে দিতে চাইলে লেখো : 70 PAINT (150, 100), 2 PAINT-এর পরে লেখা স্থানাঙ্কটি বৃত্তের ভেতরের যে-কোনও বিন্দু হলেই হবে।

বৃত্তচাপ : বৃত্ত আঁকার বিবৃতির শেষে কোন কোণ থেকে কত অবধি চাপ আঁকতে হবে তা বলে দাও। যেমন : 80 CIRCLE (150, 150), 30, 3, 0, 3.14 লিখলে একটি অর্ধবৃত্ত ফুটে উঠবে।

উপবৃত্ত বা উপবৃত্ত চাপ : বৃত্তচাপের বিবৃতির শেষে আসপেক্ট নামে একটা সংখ্যা জুড়লে উপবৃত্ত পাওয়া যাবে। 90 CIRCLE (150, 100), 30, 3, 0, 3.14, .4 লিখলে অনুভূমিক একটি উপবৃত্তের চাপ পাওয়া যাবে। কিন্তু, 100 CIRCLE (100, 150), 30,,,, 2 লিখলে একটি উল্লম্ব প্রধান অক্ষের উপবৃত্ত পাওয়া যাবে।

এইসব সরল নির্দেশ কাজে লাগিয়েই দারুণ-দারুণ সব ছবি, অ্যানিমেশন তৈরি করা যায়।

রং মেশানোর কাজ করছে কম্পিউটার

প্রোগ্রামিং-এর আগে জরুরি আলোচনা

ফোটো : তপন দাশ

কখনওই বিন্যাস বোঝাবে না। মানে A3 কোনও বিন্যাস বোঝায় না। বন্ধনীর মধ্যেই সংখ্যাটি সবসময় পূর্ণ হতে হবে।

কোনও বিন্যাসকে চিনিয়ে দেওয়ার জন্য প্রোগ্রামের প্রথমদিকে ডাইমেনশন নামে একটি বিবৃতি লিখতে হয়। 30 DIM A (5)—এই বিবৃতিটি একদিকে জানিয়ে দেয় A একটি বিন্যাস, আবার এও জানায় যে সবচেয়ে বেশি হলে পাঁচটি রাশি এই বিন্যাসে জমা থাকতে পারে।

গঠন : ক্রম DIM বিন্যাস (সাবস্ক্রিপ্ট) মনে রেখো সেই অর্থে এই বিবৃতি আর কিছু কাজের কাজ করে না। একটা DIM বিবৃতিতে অনেকগুলো বিন্যাসের কথা বলা যায়। যেমন DIM X(5), Y(10), Z(1) জানায় X, Y এবং Z এই তিনটি বিন্যাসের মোট সদস্য-সংখ্যা 5, 10 ও 1 এর বেশি না।

চকোলেটের স্বাদে ব্রেকফাস্ট!

নতুন! বনি মিক্স চকোলেট

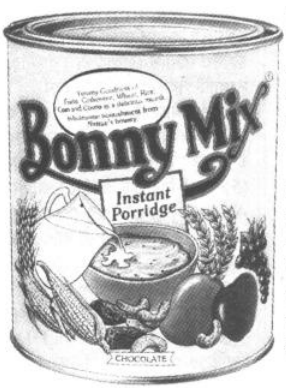

চকোলেটের সুস্বাদ নিয়ে শুরু হোক ওদের দিন!

আপনার বাচ্চাকে দিন এমন এক ব্রেকফাস্ট, যার লোভ সামলানোই দায় হবে তার। বনি মিক্স চকোলেট! এতে আছে বাছাইকরা খাদ্যশস্য, ফ্রুট ও নাট পরিজ্ আর চকোলেটের বাড়তি পুষ্টি। এই স্বাদ আপনার বাচ্চা তার বাড়ন্ত বয়েসে সত্যিই চেটেপুটে খেতেই থাকবে!

আর তৈরী করাও কত সোজা!

রান্নার ঝামেলা নেই। শুধু একটি কাঁচের বাটিতে প্রয়োজনমতো বনি মিক্স ঢালুন....ওতে আগে থেকে ফোটানো দুধ মেশান আর আলতো নেড়ে-নেড়ে মিহি ক্রীমওয়ালা মালাইয়ের মত পরিজ্ বানান!

বনি মিক্স®
নিমেষে তৈরীর পরিজ্
২-রকম ভ্যারাইটিতে ঃ
ন্যাচারাল ★ চকোলেট

গ্ল্যাক্সো – সুস্বাস্থ্যের উৎস!

GL/1/C BEN

জীবনানন্দ দাশ স্ট্রিটের পাঁচটি বাড়ির সম্পর্কে নানা খবর দেওয়া হল।
বাড়িগুলোর বৈশিষ্ট্যে বিন্যাসের নাম X হলে X (1, 3) বললে লাল, X (2, 2) বললে ৭ বছর বোঝায়।
বিন্যাসে সাবস্ক্রিপ্ট দরকারমতো বাড়ানো যায়।
এবারে একটা প্রোগ্রাম লেখা যাক :

```
10 DIM ARRAY (5)
20 FOR A = 1 TO 5
30 ARRAY (A) = AA2
40 PRINT ARRAY (A) ;
50 NEXT A
60 END
```

এটা রান করালে পরদায় ফুটে উঠবে :

```
1 4 9 16 25
```

এবার আমরা দুটো সাবস্ক্রিপ্টযুক্ত বিন্যাস ব্যবহার করে একটা প্রোগ্রাম লিখব।

```
10 FAIL = 0 : PASS = 0
20 DIM ENG (12,
50)
30 FOR I = 1 TO 12
40 FOR J = 1 TO 50
50 INPUT ENG (I, J)
60 IF ENG (I, J) < 30 THEN
70 FAIL = FAIL + 1
80 ELSE PASS = PASS + 1
90 PRINT FAIL, PASS
100 NEXT J
110 NEXT I
120 END
```

সাবরুটিন

কোনও প্রোগ্রামের কোনও অংশকে বারবার ব্যবহার করতে গেলে GOTO বিবৃতি ব্যবহার করে সেখানে নিয়ন্ত্রণ পাঠানো হয়। অনেক সময় প্রোগ্রামের কোনও-কোনও অংশ এক-একটি নির্দিষ্ট কিন্তু সম্পূর্ণ কাজ করে। ওইসব প্রোগ্রামের অংশকে সম্পূর্ণ আলাদাভাবেও লেখা যায়। সেক্ষেত্রে তাদের যেখানে ইচ্ছে লেখা যায়। এদের বলে সাবরুটিন। সাবরুটিনের প্রথম বিবৃতিটির কোনও বিশেষত্ব নেই। তাই মন্তব্য মানে REM বা চিহ্নের পর কোনও কিছু লিখলেও চলে। এর পরে অন্য বিবৃতিগুলি লিখে শেষে RETURN কথাটা লিখতে হয়।
যেমন,

```
300 REM SUBROUTINE 1
400 A = (B+C)/2
500 X = SQR (B² + C²)
600 RETURN
```

একে কাজে লাগাতে হলে মূল প্রোগ্রামে GOSUB বিবৃতিটি কাজে লাগাতে হবে। এ ক্ষেত্রে লিখতে হবে :

```
40 GOSUB 300
```

অপেক্ষক

অনেকটা সাবরুটিনের মতোই, অপেক্ষকও প্রোগ্রামের অংশ। এটি কোনও সূত্র অনুসরণ করে প্রোগ্রামকে ফল জানিয়ে দেয়। অনেক সময় আমরা অঙ্ক কষতে গিয়ে সূত্রের সাহায্য নিই,কিন্তু কীভাবে সেই সূত্র এল,তা দেখিয়ে দিই না। সেইভাবেই বারবার কোনও সূত্র না লিখে শুধুমাত্র একটি অপেক্ষকের নাম করে হিসেব করার কাজ সেরে ফেলা হয় কম্পিউটারে।
গঠন : ক্রম DEF FN নাম (প্যারামিটার) = ফরমুলা
যেমন 10 DEF FN A(X) = SQR (1 + X + X * 2)
প্রোগ্রামের মধ্যে যদি বলা হয় :

```
10 A = 2
20 LET Y = FNA(A)
30 PRINT Y
```

তা হলে পরদায় ফুটে উঠবে 7 সংখ্যাটি।

ফাইল

প্রোগ্রাম চলার সময় চাবি টিপে-টিপে তথ্য না দিয়ে স্থায়ীভাবে তথ্য জমিয়ে রাখা হয় ফাইলে। প্রয়োজনমতো ফাইল থেকে তথ্য সংগ্রহ করে কম্পিউটার। কাজের শেষে ফলাফলও জমিয়ে রাখা যায় অন্য এক ফাইলে। কাগজের ফাইলের মতোই এই ইলেকট্রনিক ফাইলেও তথ্য আর প্রোগ্রাম জমিয়ে রাখা যায়।
ফাইল আবার দু'রকম হয়। ইচ্ছেমতো পড়ার-লেখার (র‍্যান্ডম অ্যাকসেস) এবং ক্রমানুসারী (সিকোয়েন্সিয়াল অ্যাকসেস)। প্রথমটিতে তথ্য ইচ্ছেমতো জায়গায় জমা রাখা যায় এবং যে-কোনও জায়গার তথ্য দ্রুত পড়া যায়। কিন্তু দ্বিতীয়টিতে তথ্য জমা রাখা ও পড়ার কাজ ইচ্ছেমতো করা যায় না, পর-পর করতে হয়। দু'রকম ফাইলেরই নানারকম সুবিধে ও অসুবিধে আছে।
বেসিক ভাষা শিখতে গেলে দরকারি সমস্ত ব্যাপারে সংক্ষেপে আমরা আলোচনা করলাম। এই ভাষায় দক্ষতা বাড়াতে গেলে লিখতে হবে বহু ছোট-বড় প্রোগ্রাম। অভ্যেস করতে-করতেই প্রোগ্রাম লেখার মূল ব্যাপারগুলো বোঝা যাবে। (ক্রমশ)

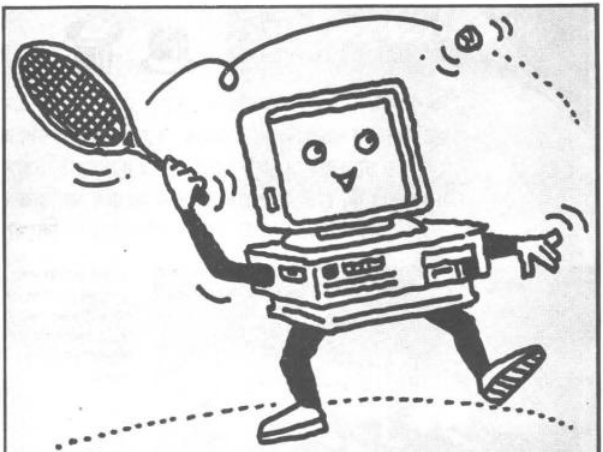

নকল বুদ্ধি

মানুষ যেভাবে ভাবনাচিন্তা করে, ঠিক তেমনভাবে যদি যন্ত্র চিন্তা করে দিতে পারে তা হলে দারুণ সুবিধে হয়। সেরকম যন্ত্র আবিষ্কারের চেষ্টায় কম্পিউটার বিজ্ঞানের গবেষণা-মহলে এখন তোলপাড়। জাপান, ইউরোপ ও আমেরিকায় এ নিয়ে এখন জোর তৎপরতা চলছে। কিছু সাফল্যও পাওয়া গেছে। সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে চিন্তাভাবনা করে যুক্তি সমাধানের কাজটি করতে পারলে রকেট চালানো থেকে শুরু করে টেনিস খেলার সঙ্গী হয়ে উঠতে পারবে কম্পিউটার।

ম্যাজিক মানেই চমক ! ম্যাজিক দেখে মুগ্ধ হননি এমন মানুষ পৃথিবীতে বোধ হয় দুর্লভ । বহুকাল ধরে দেশে-বিদেশে জাদুকররা অসামান্য সব ম্যাজিক দেখিয়ে চলেছেন । সেই ম্যাজিক দেখানোর ইতিহাসও ম্যাজিকের মতোই চমকপ্রদ । কী সেই ইতিহাস ? কেন আজও ম্যাজিক এত চমকপ্রদ ? আশ্চর্য এইসব তথ্য ও নানা বিচিত্র ঘটনার কথা লিখেছেন অদ্রীশ বিশ্বাস

জাদুকর গোগিয়া পাশা দেখাচ্ছেন তরবারির ওপর শুইয়ে দেওয়ার খেলা । নীচে, লাঠির ওপর শরীর রেখেছেন জাদুকর মার্ক উইলসন-এর সহকারী

ঠিক হল ব্রিজের ওপর থেকে হুডিনিকে জলে ফেলে দেওয়া হবে । খবর শুনে চারদিক থেকে বহু লোক এসে জড়ো হল ব্যাপারটা কী হয় দেখতে । অসংখ্য লোকজনের সামনেই লোহার শক্ত চেন দিয়ে হুডিনিকে বাঁধা হল । হাতে পরানো হল হাতকড়া । তারপর একটা শক্ত কাঠের বাক্সে ভরে ভাল করে তালাচাবি দিয়ে দেওয়া হল । কেউ-কেউ সন্দেহ করলেন তবুও । যদি বের হয়ে যান ! আনা হল হাতুড়ি, পেরেক । কাঠের বাক্সের চারধারে পেরেক পুঁতে দেওয়া

ম্যাজিক! ম্যাজিক!!

হেনিং দেখাচ্ছেন বালির রং বদলের খেলা

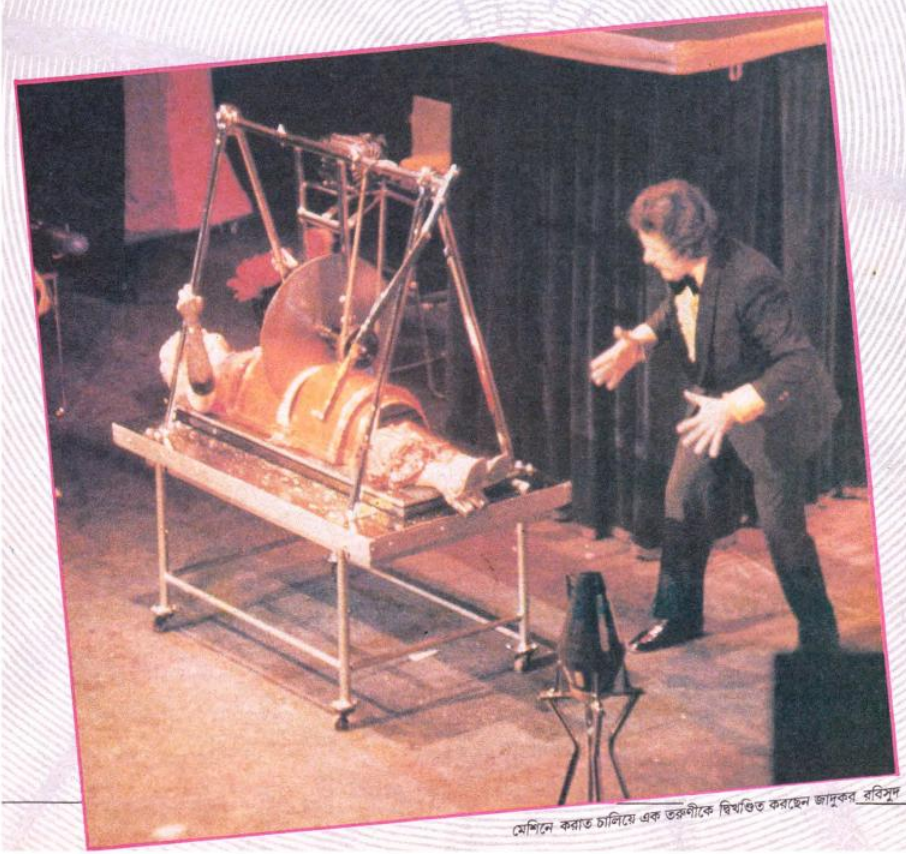

মেশিনে করাত চালিয়ে এক তরুণীকে দ্বিখণ্ডিত করছেন জাদুকর রবিসুদ

বাজা তোরা
রাজা যায়
বুদ্ধদেব গুহ
উল্কা-রহস্য
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
ফেরারি
মতি নন্দী
সোনারুরা গল্পের ইনকা
প্রবাল দ্বীপের রহস্য
ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

দাম ৪৮ টাকা

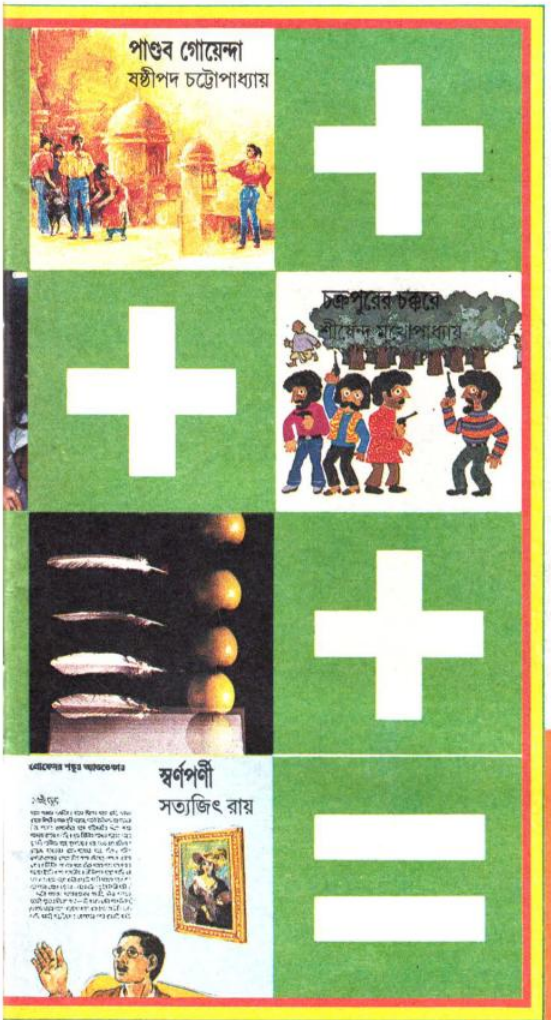

রহস্য, রোমাঞ্চ, অ্যাডভেঞ্চার, বিজ্ঞান, খেলা, কল্পকাহিনী··· সেরা লেখার যোগফল··· আনন্দমেলা

সত্যজিৎ রায়ের প্রোফেসর শঙ্কু তখন বয়সে তরুণ। ওই বয়সেই তিনি আবিষ্কার করেছিলেন এক মহৌষধ। শঙ্কু তো এবার আছেনই, আর আছেন বিমল করের কিকিরা। এবং ময়ূরগঞ্জের ভূতুড়ে বাড়ি। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাকাবাবু, না সন্তুকেও যুক্ত করো। আছে ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের পাণ্ডব গোয়েন্দা। তোমাদের সবার প্রিয় শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসও যোগ দিয়েছ তো ? এবার গল্পের হিসেব। আশাপূর্ণা দেবী, লীলা মজুমদার, ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের গল্প, বুদ্ধদেব গুহ, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, দুলেন্দ্র ভৌমিকের বড় গল্প। এখানেই শেষ নয়। আছে আরও অনেক গল্প। সব মিলিয়ে দারুণ এক যোগফল। ইতালির বিশ্বকাপে মারাদোনার মারপ্যাঁচ, ভুতুড়ে চিত্রকাহিনী, বিজ্ঞান-নিবন্ধ, আরও কত কী। অন্নদাশঙ্কর রায়, অরুণ মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ছড়া ও কবিতা। কী নেই ! এত হইচইয়ের নিট ফল একটাই—তোমাদের মনের মতো পূজাবার্ষিকী আনন্দমেলা।

তোমাদের মনের মতো রঙিন পূজাবার্ষিকী

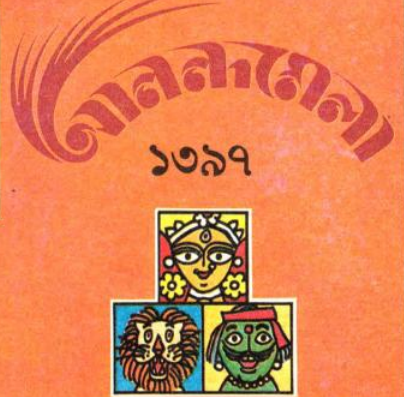

সার্কাসেও ছিল ম্যাজিকের খেলা

মহিলা জাদুকর আদেলেইদ হারমান

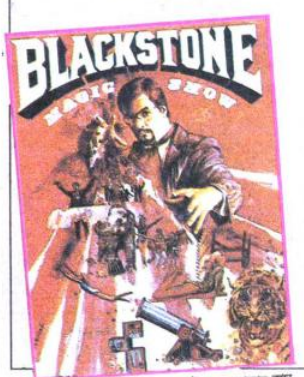

মার্কিন জাদুকর হ্যারি ব্ল্যাকস্টোনের খেলায় বাঘ, হাতি ও কামানও থাকত

হল। তারপর বাক্সটি ধরে ব্রিজের ওপর থেকে নদীতে ফেলতে যেতেই, দেখা গেল দর্শকদের মধ্যে দাঁড়িয়ে হুডিনিও মদত দিচ্ছেন বাক্সটা জলে ফেলতে। আবারও সকলে বোকা হয়ে গেল বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাদুকর হ্যারি হুডিনির ম্যাজিক দেখে। এইভাবে সারা পৃথিবীতে অসংখ্য জাদুকর তাঁদের ম্যাজিক বা জাদুবিদ্যা দেখিয়ে চলেছেন, আর লক্ষ-লক্ষ মানুষকে অবাক করে দিচ্ছেন। অথচ এই জাদুবিদ্যা কোনও অলৌকিক শক্তি বা তন্ত্রমন্ত্রের ব্যাপার নয়। শুধুই বুদ্ধি আর কৌশলে দর্শকদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে যাওয়া। হয়তো খুব সহজ কৌশলেরই দারুণ কোনও ম্যাজিক দেখে আমরা স্তম্ভিত হয়ে যাই। কিন্তু এই কৌশলটাকে গোপন রেখে কোনও-কোনও জাদুকর নিজেদের দুর্দান্ত শক্তিধর বলে দাবি করেন।

ম্যাজিক জানলেই ম্যাজিশিয়ান হওয়া যায় না। ম্যাজিক দেখাতে গেলে চাই উপস্থিত বুদ্ধি, সুন্দর কথা বলার ক্ষমতা, অঙ্গভঙ্গির মধ্যেও সুন্দর একটি মাত্রা থাকা চাই। আর চাই সমস্ত খেলার মধ্যেই উন্নত রুচির পরিচয়।

যিশু খ্রিস্টের জন্মের ঠিক পরে-পরেই মিশরের এক গ্রামের রাস্তা ধরে আনমনে হেঁটে যাচ্ছিল বারো-তেরো বছরের একটি ছেলে। রাগ করে বাড়ি থেকে পালিয়েছে সে। বহুক্ষণ হেঁটে-হেঁটে ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত সেই ছেলেটির সঙ্গে এক ফকিরের দেখা হয়ে

মার্ক উইলসন শূন্যে ভাসিয়েছেন স্ত্রী নানি ডারওয়েলকে। পেছনে হলিউডের ক্যাসেল ক্লাব

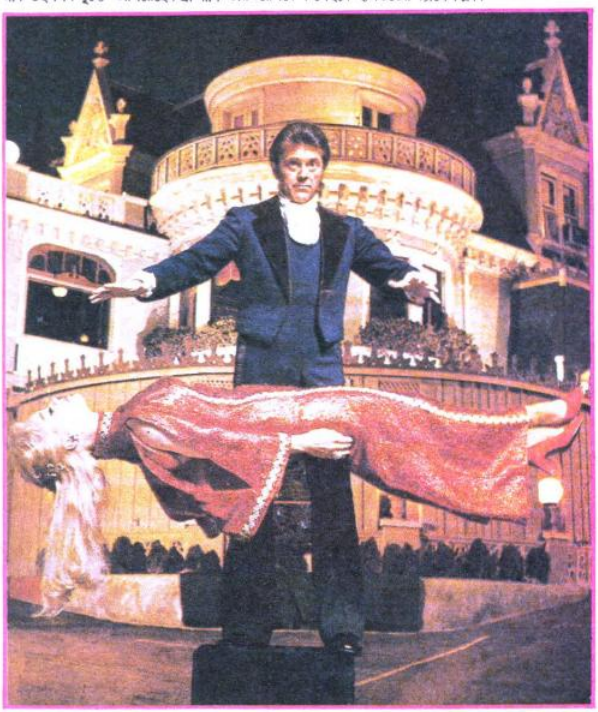

টেলিস্মিথের আঙুলে জ্বলছে মোমবাতির মতো আগুন

গেল। সেই ফকির তাকে শূন্য থেকে ফল আর মিষ্টি এনে খেতে দিলেন।
মন্ত্র বলতেই পাত্রটা জলে ভরে গেল। সেই জল খেয়ে ফকিরের সঙ্গ নিল ছেলেটি। তারপর বহু বছর ফকিরের কাছে থেকে এই ধরনের আশ্চর্য সব ব্যাপার শিখে নিল সে। বড় হয়ে চারদিকে তা দেখিয়েও বেড়াতে লাগল। ফলে, লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ল তার নাম। পৌঁছে গেল মিশরের এক গীতিকবির কানেও। লিখে ফেললেন তিনি এই সমস্ত কাহিনী। অনেক পরে আমেরিকার এক ম্যাজিক-গবেষক ক্লার্ক মুর খুঁজে পেলেন ঘটনাটা। এটাই এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে প্রাচীন ম্যাজিকের গল্প।
ম্যাজিক মানেই মিশর। কিন্তু গ্রিস, ইংল্যান্ড, চিন, ভারত প্রভৃতি দেশে প্রায় দু' হাজার বছর আগেই ম্যাজিকের চর্চা ছিল। অনুন্নত মানুষেরা এই জাদুকরের ভয়ে দুটো করে নাম রাখত নিজেদের। একটা নাম সকলে জানত আর অন্য নামটা গোপন রাখত, যাতে জাদুকর তাদের কোনও ক্ষতি করতে না পারে। এক সময় জাদুকরদের প্রভাব এত বেড়ে গিয়েছিল যে, ইউরোপে জাদুবিদ্যা বা ম্যাজিক নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। ১৪৫০ থেকে ১৬৫০ সাল পর্যন্ত হাজার-হাজার জাদুককে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। এই সময় জাদুকররা কেউই পৃথিবীবিখ্যাত হয়ে উঠতে পারেননি। জাদুবিদ্যা জানার অভিযোগে শেষ প্রাণদণ্ড দেওয়া হয় স্কটল্যান্ডে, ১৭২২ সালে।
কোনও-কোনও দেশে অবশ্য রাজাই জাদুকর রাখতেন। 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'-এর সেই জাদুকর বরফি যেমন ছিল। সেইসব জাদুকর রাজার মন্দিরকে জাগ্রত দেবতার মন্দির বলে প্রচার করতে নানারকম ম্যাজিকের সাহায্য নিতেন। মন্দিরের দরজা খোলার সময় বজ্রের মতো শব্দ শোনা যেত। মূর্তির পেছনে লুকিয়ে থেকে কথা বলা হত।
১৫০৪ সালে ফ্লোরেন্সের এক স্বর্ণকার একটি 'ম্যাজিক লণ্ঠন'-এর সাহায্যে ধোঁয়ার মেঘে একটা দৈত্যের প্রতিমূর্তি তৈরি করেছিলেন। এমনই অদ্ভুত ছিল প্রাচীন ম্যাজিকের বিষয়বস্তু। যেমন, একটা রাজ্য দেখানো হত, যেখানে কিছু দুষ্ট জাদুকর আর সন্দেহজনক মনের ডাইনিরা থাকত। যান্ত্রিক এই জাদুর দেশে নানা অলৌকিক ঘটনা ঘটত। এই সমস্ত সম্বন্ধে ইংরেজ লেখক রেজিনাল্ড স্কট ১৫৮৭ সালে একটি বই প্রকাশ করেন, যাতে তিনি এই জাদুকরদের বিদ্যা বা কৌশল বর্ণনা করেন।
প্রাচীনকালে মঞ্চের ব্যবস্থা ছিল না বলে জাদুকররা তাঁদের খেলা দেখাতেন মন্দিরের চাতালে, রাস্তাঘাটে, রাজসভায়, পাহাড়ের সমতল ভূমিতে। মঞ্চে ম্যাজিক দেখানো শুরু হয় অনেক পরে। ১৭৮৫ সালে ক্যাভেলিয়ার যোসেফ পিনেট্টি নামে একজন জাদুকর প্যারিসে প্রায় হুডিনির মতোই একটি ম্যাজিক দেখাতেন। তিনি নিজেকে একটা ভারী চেনে বাঁধতেন আবার তা থেকে বেরিয়ে আসতেন। চোখ বাঁধা অবস্থায় সমস্ত জিনিসের নাম বলে দিতে পারতেন।
১৮৪০ সালে চিনা আর ইংরেজদের মধ্যে যখন আফিম যুদ্ধ চলেছে, সে সময় জন হেনরি অ্যান্ডারসন স্কটল্যান্ড থেকে লন্ডনে যান ম্যাজিক দেখাতে। ততদিনে মঞ্চে ম্যাজিক দেখানো চালু হয়ে গেছে। অ্যান্ডারসনের ম্যাজিক ছিল ভারী চমৎকার। ৩০ বছর ধরে তিনি ম্যাজিক দেখিয়ে একজন উল্লেখযোগ্য জাদুকর হয়ে উঠেছিলেন। এঁর সময়েই জেন ইজেন রবার্ট হাওডিন নামে এক জাদুকর প্যারিসে

মেক-আপ

ম্যাজিক দেখানোর জন্য জাদুকররা মেক-আপ নিয়ে থাকেন। কারও-কারও মেক-আপের মধ্যে আবার বিশেষ কোনও বৈশিষ্ট্যও থাকে। যেমন, উইলিয়াম রবিনসন, যিনি চুং-লিং-সু নাম নিয়ে খেলা দেখাতেন। তিনি মাথার চুল ঢেকে ন্যাড়া সাজতেন। তরুণ জাদুকর জেরমি ডেন নাকের নীচে লাগাতেন কৃত্রিম চিনে গোঁফ। যেটা ঠোঁটের দু'পাশে অনেকটা ঝুলে থাকত। এ-সবই জাদুকর নিজেকে বিশেষভাবে পরিচিত করাবার জন্য করে থাকেন।

আলোড়ন তুলেছিলেন। মঞ্চের অল্প আলোয় নিয়ে আসতেন একজন যুবককে। কথা বলে, গান করে শোনাত সেই যুবক। সবাই যখন আনন্দে মেতে উঠত, হাওডিন তখন মঞ্চের মাঝখান থেকেই অদৃশ্য করে দিতেন যুবকটিকে। এই ম্যাজিকটি এতই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যে, অন্য জাদুকররাও তা নকল করতে থাকেন। হাওডিন

কিন্তু আগে পেশায় ছিলেন ঘড়ি প্রস্তুতকারক আর বিদ্যুৎ-কর্মী। জীবনের সঞ্চিত অর্থ দিয়ে প্যারিসে ছোট্ট একটি থিয়েটার হল তৈরি করেন। শুধু ম্যাজিকের জন্য এটিই প্রথম থিয়েটার হল। ম্যাজিককে যান্ত্রিক আর কলাকৌশলের দিক থেকে হাওডিন উন্নত করে তোলবার পর ম্যাজিককে আরও জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে দেন আলেকজান্ডার হারম্যান। তিনি মিশরীয় একটি হলে এক হাজার রাত্রি ম্যাজিক দেখান। ইংল্যান্ডের এই মিশরীয় হলের নামই হয়ে যায় 'রহস্যের বাড়ি'। হারম্যান গ্যাস লাইটের বদলে ইলেকট্রিক লাইট আনেন। সে আলোয় আরও উন্তত খেলা দেখান। একটি খেলায় তিনি একজন অপরাধীকে পাহারা থাকা সত্ত্বেও এক জেল থেকে আর-এক জেলে পৌঁছে দিতেন এবং শেষে দর্শকদের মধ্যে হাজির করতেন। তাঁর ম্যাজিকগুলো ছিল খুব জাঁকজমকপূর্ণ। ১৮৯৬ সালে হারম্যান হার্ট অ্যাটাকে মারা গেলে শো বন্ধ হয়ে যায়। পরে আমেরিকায় তাঁর জায়গা নেন হ্যারি কেলার, হাওয়ার্ড

নিজেকে শিকলে বেঁধে বিখ্যাত খেলাটি দেখাচ্ছেন হুডিনি

ম্যাজিক নিজেকেই জানতে হয়, বুঝতে হয়

পি·সি·সরকার (জুনিয়ার) ম্যাজিকের জগতে অত্যন্ত বিখ্যাত নাম। তাঁর এই সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন স্বপ্নাতীত সরকার

প্রশ্ন : ম্যাজিক কী ?

উত্তর : ম্যাজিক ব্যাপারটি সৃষ্টি হয় সেখান থেকে, যেখানে বাস্তবতা শেষ হয়। সেখান থেকেই কল্পনার সৃষ্টি। ম্যাজিক বা জাদুবিদ্যাকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। একটি 'ব্ল্যাক ম্যাজিক', আর বিশুদ্ধ জাদু অন্যটি। ব্ল্যাক ম্যাজিকের একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন দিক থাকে। কিন্তু বিশুদ্ধ জাদুবিদ্যা শুধুই মানুষকে আনন্দ দেওয়ার জন্য। নাটক হচ্ছে কোনও গল্পের অভিনীত রূপ। তেমনই রূপকথাকে যখন নানা ভঙ্গিতে উপস্থাপন করা হয়, আমরা তাকে বলি বিশুদ্ধ জাদুবিদ্যা। কোনও চিত্রকর যদি একটি ফুল আঁকেন, তা তখন 'আর্ট', কিন্তু কোনও ম্যাজিশিয়ান যদি সেই ফুলটি ক্যানভাস থেকে তুলে আনেন, তা তখন 'কমপ্লিট ফর্ম অব আর্ট', শিল্পের শেষ কথা। যখন কেউ ভাল গান গায় আমরা বলি, 'কণ্ঠে জাদু আছে।' কেউ ভাল লিখলে বলি, 'কলমে জাদু আছে।' ফুটবল খেললে বলি, 'পায়ে জাদু আছে!' তাই জাদু হচ্ছে শিল্পের মানদণ্ড।

প্রশ্ন : জাদুবিদ্যার গোড়ার কথা সম্পর্কে যদি কিছু বলেন ?

উত্তর : 'ইন্দ্রজাল' কথাটির অর্থ ইন্দ্রকে খুশি করতে যে জাল বা বিদ্যার সাহায্য নেওয়া হয়, সেইটি। লাতিন ভাষা 'ম্যাজাই' বা 'ওয়াইসম্যান'বা 'বুদ্ধিমান মানুষ' থেকে ম্যাজিক কথাটি আসে। আমাদের দেশে ৬৪টি কলার মধ্যে ইন্দ্রজাল হচ্ছে ২০তম। প্রচলিত আছে যে, দেবতাদের সঙ্গে অসুরদের যুদ্ধ হত। দেবতারা ইন্দ্রকে সেই যুদ্ধের বিবরণ দিতেন। কীভাবে অসুরদের নিধন করা হল তা দেখাতে গিয়ে দেবতারা পড়লেন বিপদে। তাঁরা আবিষ্কার করলেন এক বিদ্যার, যা দিয়ে সম্ভব হয়েছিল যুদ্ধের বিবরণ দেওয়ার, মায়ার সাহায্যে। সেই বিদ্যার নামই ইন্দ্রজাল। খ্রিস্টের মৃত্যুর ৩০০ বছর পরের আঁকা এক কাল্পনিক ছবিতে দেখতে পাওয়া যায় যে, খ্রিস্টের হাতে একটি জাদুদণ্ড বা ম্যাজিক ওয়ান্ড শোভা পাচ্ছে।

প্রশ্ন : বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের ওপর ম্যাজিক কতটা নির্ভরশীল ?

উত্তর : আমরা ম্যাজিশিয়ানরা মঞ্চে যা পরিবেশন করি তা আসলে 'সায়েন্স ইন আ মিরাকুলাস ফর্ম।' অবশ্যই পুরো ব্যাপারটার মধ্যে বিজ্ঞান থাকে। কিন্তু একটা কথা হচ্ছে যে, আজ যা বিজ্ঞান, তা গতকাল ছিল ম্যাজিক। আজ যা ম্যাজিক, তা হয়ে যাবে আগামী দিনের বিজ্ঞান। ম্যাজিক হল, ২৫ ভাগ চাতুরি ও ৭৫ ভাগ উপস্থাপনার কৌশল।

প্রশ্ন : আপনার ছেলেবেলা নিয়ে কিছু বলুন।

উত্তর : আমাদের সারা বাড়িটাই ছিল ম্যাজিকের বাড়ি। আমি যখন ছোট ছিলাম তখন আমি জানতাম আমার দু'জন বাবা। একজনের নাম বাবা, আর একজনের নাম পি·সি·সরকার। পি·সি· সরকার খুব ভালমানুষ ছিলেন। পাগড়ি পরতেন, মজার পোশাক পরতেন, মজার-মজার কথা বলতেন, মঞ্চে দারুণ সব খেলা দেখাতেন। কিন্তু খবরের কাগজ পড়া, চা খাওয়া ওই রাগী মানুষটি, ওই বাবাকে একটুও ভালবাসতাম না। রাগী বাবা সব সময় আমাকে শাসন করতেন, আমাকে মানুষ করার দিকে নজর ছিল তাঁর।

পি·সি·সরকার – বাবার সঙ্গে মেলামেশার চেষ্টা করতাম। পরে জানতে পারলাম যে পি·সি·সরকার ও বাবা একই মানুষ। বাবা চাইতেন যে-জাদুর জগতে আমরা বাড়িতে থাকতাম তা থেকে বাস্তব জগতে আনতে। পি·সি·সরকার – বাবাকে আমার ভাল লাগত। কিন্তু তিনি আমার সঙ্গে কথা বলতেন না। এদিকে যে-বাবাকে আমার ভাল লাগত না, সেই বাবা আমার খোঁজখবর নিতেন। পি· সি· সরকার যখন বাড়ির বাইরে যেতেন, তখন হয়তো মা'র কাছে চাবি থাকত। আমি চুপিচুপি চাবি খুলে বাবার রসার ঘরে যেতাম। যেই ঘরে বাবা লেখাপড়া করতেন, ছবি আঁকতেন, সেই ঘরে। ওটাই ছিল আমার কাছে সবচেয়ে রহস্যময় জায়গা। ঘরের প্রতিটি জিনিস খুঁটিয়ে দেখে আবার জায়গামতো রেখে দিতাম। বাবা আমায় কোনওদিন ধরতে পারেননি! ঠাকুরদার মুখে শুনেছি যে, 'ছেলেটা মানুষ হল না।' তাই ভাবতাম মানুষ হওয়ার জন্য বাবা এত বই পড়ছেন! বাবা বাস্তব ও কাল্পনিক জগতের মধ্যে এক সেতুর মতো ছিলেন আমার কাছে। প্রায় ছোটবেলাতেই আমি 'ম্যাজিক,ম্যাজিক', 'কেমিক্যাল ম্যাজিক' ও 'ম্যাথম্যাজিক' বই তিনটি লিখি। বাবার কাছ

থার্সটন প্রমুখরা। থার্সটন খুব বড় জাদুকর ছিলেন। বিশেষত, তাসের খেলায় তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিলেন না। যেমন, টাকার খেলায় নেলসন ডাউনস-এর সমকক্ষ মেলা ভার, তেমনই। সে সময় ভাউডেভিল্লি থিয়েটার হলকে শুধু ম্যাজিক দেখানোর হল হিসেবে ঘোষণা করা হয়। উইলিয়াম রবিনসন বহুদিন এখানে খেলা দেখিয়েছিলেন। কিন্তু মজা হল, রবিনসন নিজেকে বলতেন 'চিনা জাদুকর'। নাম নেন চুং-লিং-সু। খুবই বিখ্যাত হয়েছিলেন তিনি। অন্য একজন আমেরিকান, হোরাস গোলডিন ভাউডেভিল্লি থিয়েটারে 'র‍্যাপিড ফায়ার' নামে একটি আশ্চর্য খেলা দেখাতেন। তার আগে দর্শকদের বলতেন, তাঁর আগের জাদুকররা

থেকেই লেখাপড়াকে ভালবাসতে শিখি ছোটবেলায়।

প্রশ্ন : আপনার বাবা পি· সি· সরকার (সিনিয়ার)-এর খেলা কেমন ছিল ?

উত্তর : বাবার প্রত্যেকটি খেলার মধ্যে একটা নিজস্বতা ছিল। তাঁর টেকনিক ছিল অসাধারণ! ম্যাজিকের পেছনে যে রহস্যটা ছিল তার রসটাকে দারুণভাবে উপস্থাপন করতেন, ডিটেলের মধ্যে দিয়ে।

কোনও জায়গায় হয়তো লাল রং দেওয়া হয়েছে। আমি বললাম, "ভাল লাগছে না বাবা।" তিনি বলতেন, "দেখিস, লোকে ঠিক নেবে।" সত্যিই দেখতাম, লোকে ওই রংই চাইছে। পি· সি· সরকার যদি না আসতেন, তা হলে মঞ্চে এখনও হয়তো আমরা কোট-প্যান্ট, বো, টুপি পরা, হাতে ম্যাজিক ওয়াণ্ড-ধরা ম্যাজিশিয়ানদের দেখতে পেতাম। তিনিই প্রথম ইন্দ্রের সাজে, রাজবেশে মঞ্চে এসেছিলেন, একটি রাজকীয় শিল্প প্রদর্শনের জন্য। বিদেশীরা তাই বলেন,"সরকার অ্যান্ড সরসারি" বা "সরকার ও ইন্দ্রজাল একই কথা।"

প্রশ্ন : তাঁর জনপ্রিয়তম খেলা কোনটি ?

উত্তর : পি· সি· সরকারের জনপ্রিয়তম বা শ্রেষ্ঠ খেলা কোনটি তা বলা মুশকিল। যেমন পিকাসোর শ্রেষ্ঠ ছবি, রবিশঙ্করের শ্রেষ্ঠ সুর বা রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিতা কোনটি ? আমরা জানি না! তেমনই পি· সি· সরকারের ম্যাজিকের ওভাবে মূল্যায়ন করা কঠিন। তাঁর সব ম্যাজিকই অসাধারণ, সবই জনপ্রিয়, সবই শ্রেষ্ঠ! পি· সি· সরকারের সবচেয়ে বড় ম্যাজিক তাঁর ইমেজ, যার আবেদন শাশ্বত।

প্রশ্ন : আপনার কোন খেলা দেশ-বিদেশে সবচেয়ে জনপ্রিয় ?

উত্তর : বিদেশে আমার সবচেয়ে জনপ্রিয় সেইসব খেলা যার মধ্যে স্কিল বা দক্ষতা বেশি। বাবার ও আমার ম্যাজিক, উদয়শঙ্করের নাচ, সত্যজিৎ রায়ের ছবি, রবিশঙ্করের সুর আমার মনে হয় এই মিস্টিসিজম-এর জন্য বিদেশে এত জনপ্রিয়। এরই মধ্যে বাবার 'জিভ কাটা খেলা' ও আমার 'এক্স রে আইস' যার মধ্যে বুদ্ধির ছাপ আছে, খুবই জনপ্রিয়। কিন্তু দেশে আমার অনুষ্ঠান দর্শকরা ভালবাসেন, তাঁরা ভালবাসেন আমার খেলা।

প্রশ্ন : ছোটরা ম্যাজিক শিখবে কী করে ?

উত্তর : ম্যাজিক কখনও শেখানো যায় না। ম্যাজিক জানতে হয়, বুঝতে হয়।

প্রশ্ন : 'গিলি-গিলি-গে'-র পর আপনি ম্যাজিক নিয়ে ছবি করার কথা ভাবছেন না ?

উত্তর : হ্যাঁ, আমার ইচ্ছে আছে নিজের নির্দেশনায় ছবি করব। এর মধ্যে আমি কয়েকটা ছবি অবশ্য করেছি, প্রতিটিই ১০ থেকে ১৫ মিনিটের। 'গ্রানি' বলে একটি ছবি দেখা যাবে শিগগিরই, আমার ম্যাজিক-শো-এর মধ্যে। ইচ্ছে আছে আরও ছবি করার।

প্রশ্ন : ম্যাজিক ছাড়া আপনার আর কী কী শখ আছে ?

উত্তর : আমার প্রথম শখের নাম ম্যাজিক, দ্বিতীয় শখের নাম ম্যাজিক, তৃতীয় শখের নামও ম্যাজিক!

"মা শোন শোন দারুণ খবর !"

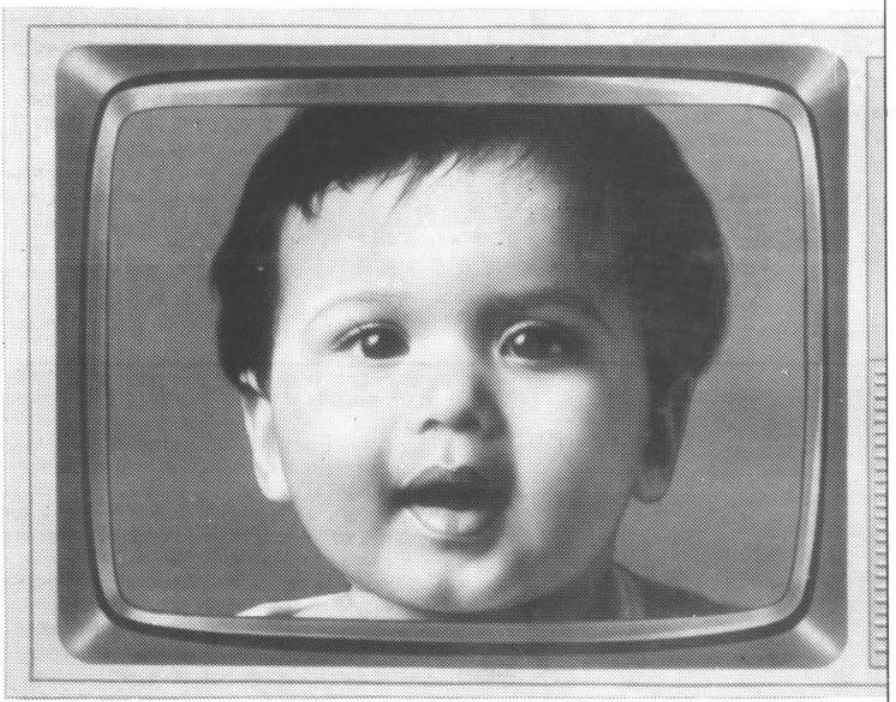

"আমার প্রিয় ফ্যারেক্স এবার এক অভাবনীয় দামে !!"

পুষ্টিকর, মুখরোচক, দুধযুক্ত ফ্যারেক্স সিরিয়াল এবার এক সুবিধাজনক ও স্বাস্থ্যকর নূতন রিফিল প্যাকে।

রিফিল প্যাকটি খুলুন, আর সবটুকু তক্ষুনি একটা এয়ারটাইট্ কৌটায় ঢেলে বন্ধ করে রাখুন।

টা. ১১/৫০-এ ২০০ গ্রাম

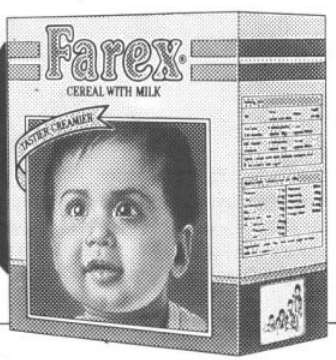

নতুন রিফিল প্যাক

ফ্যারেক্স: বেড়ে ওঠার এক স্বাদভরা উপায় !

বর্তমানে বাছা বাছা বাজারগুলিতে পাওয়া যাচ্ছে।

*একই সাশ্রয়কর দামে, যে কোন দোকানে।

GX.265.90.Bn

কীভাবে খেলা দেখাতেন। এতে খেলা সহজেই জমে উঠত। পি টি সেলবিট ছিলেন তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। দারুণ প্রয়োগকৌশলে দেওয়ালের গা দিয়ে হেঁটে যেতেন তিনি। করাত দিয়ে একজন তরুণীকে দ্বিখণ্ডিত করার খেলাটা অবশ্য দু'জনেই দেখাতেন। আর এই নিয়েই লাগল বিবাদ, কে প্রথম এই খেলার আবিষ্কারক ? বিবাদ মিটল না, কিন্তু বছর-বছর ধরে ভাউডেভিল্লির জনপ্রিয়তা বাড়তেই থাকল। নতুন-নতুন পদ্ধতিতে জনগণের পছন্দের ওপর ভিত্তি করে খেলা দেখানো হতে লাগল। এই পদ্ধতি এতই জনপ্রিয় হল যে, দান্তে ও জাম্পা নামে আরও দু'জন জাদুকরকে খেলা দেখানোর জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল। দান্তে একটি ৪ ফুটের

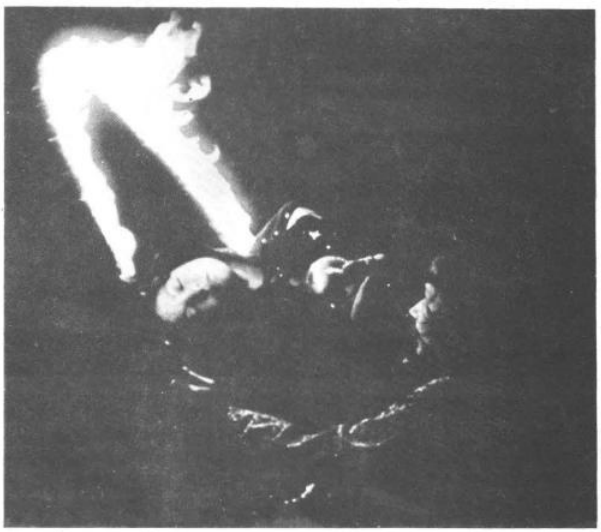

আগুনের রিং-এর সাহায্যে মিচেল প্রমাণ করছেন যে সহকারিণী শূন্যে ভেসে আছেন

জাঁদুদণ্ড নিয়ে খেলা দেখাতেন। জাদুদণ্ডকে আগে বলা হত মন্ত্রওয়ালা লাঠি। এই লাঠিগুলো হত কালো, খয়েরি, লাল কিংবা কোনও গাঢ় রঙের। লম্বায় ১ থেকে ২ ফুট। জাদুদণ্ড ছাড়াও জাদুকররা নানারকম আয়না এবং কঙ্কালও ব্যবহার করতেন। কঙ্কালের মধ্যে ব্যবহার করা হত মানুষের করোটি, নানা জীবজন্তুর হাত ও পায়ের হাড়। এই রীতি সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী থেকেই চালু হয়। মানুষকে ভয় দেখিয়ে প্রভাবিত করার জন্যই এসবের ব্যবহার করা হয়। তার বাইরে অন্য কোনও রহস্য নেই। অবশ্য জাদুদণ্ডটাকে নানা ম্যাজিকের কৌশলেও ব্যবহার করা হয়। তবে, কঙ্কাল ও জাদুদণ্ডের ব্যবহার ক্রমশ কমে আসছে। তার কারণ, ভয় দেখিয়ে দর্শককে প্রভাবিত করার ব্যাপারটা এখন আর ম্যাজিকের উদ্দেশ্য নয়। এখন ম্যাজিকের উদ্দেশ্য মানুষকে আনন্দ দেওয়া। ম্যাজিকের কৌশলের প্রয়োজনে জাদুকর তাঁর প্রায় সমস্ত জিনিসকেই ব্যবহার করেন। চেয়ার, টেবিল, যন্ত্রপাতি, স্টেজ, পরদা সবই সুবিধেমতো ম্যাজিকের প্রয়োজন অনুযায়ী তৈরি করানো হয়। জাদুকরের পোশাকটাও ঠিক এইভাবে নানা কৌশলে তৈরি। কোথাও লুকনো পকেট, কোথাও বাড়তি কাপড়, কোথাও লুকনো বোতাম থাকে ম্যাজিকের প্রয়োজনে। দর্শকদের উদ্দেশ্যে নানারকম কথাবার্তা বলার ফাঁকে জাদুকর তাঁর লুকনো পকেটে কিছু লুকিয়ে ফেলেন। জাদুকরের সুন্দর কথার আকর্ষণে দর্শকরা বুঝতেও পারেন না, কখন জাদুকর তাঁর গোপন কৌশলটি সেরে নিয়েছেন। এভাবেই দর্শকদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে ম্যাজিক দেখান জাদুকররা।

১৯৩০ সাল থেকে গোল্ডিনের করাতে মানুষ কাটার খেলাটিকে আরও উন্নত করে তুললেন আমেরিকার ব্ল্যাকস্টোন। দ্বিতীয়

ডিকেন্স ও লিঙ্কন

'ডেভিড কপারফিল্ড' কিংবা 'এ টেল অব টু সিটিজ'-এর লেখক চার্লস ডিকেন্স সুন্দর ম্যাজিক দেখাতে পারতেন। ম্যাজিক দেখিয়ে খ্যাতিলাভ করতে না পারলেও, নানা সামাজিক অনুষ্ঠানে অতিথিদের আনন্দ দিতে বা বাচ্চাদের জন্মদিনে ও বড়দিনের পার্টিতে আজীবন ম্যাজিক দেখিয়ে গেছেন ডিকেন্স।

আব্রাহাম লিঙ্কন যে ম্যাজিক জানতেন এ-কথা খুব বেশি লোক জানত না। বিখ্যাত ইতিহাসের অধ্যাপক ডঃ হ্যারি ফোল্ড এ-বিষয়টির প্রথম উল্লেখ করেন। আমেরিকার পার্লামেন্টে একবার তাঁর সহকর্মীর একটি গোপন চিঠি লিঙ্কন ম্যাজিকের মাধ্যমে হস্তগত করেন। এই ঘটনায় পার্লামেন্টের অন্যান্য সদস্য সবাই অবাক হয়ে যান। লিঙ্কন বলেছিলেন, পার্লামেন্টে সব সময় সতর্ক থাকা উচিত, এই কথাটা জানাতেই তিনি ম্যাজিকটা দেখিয়েছিলেন।

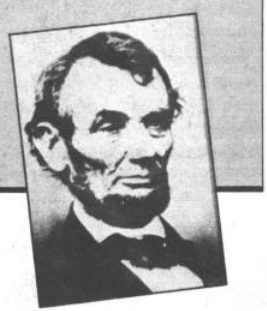

বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরও, বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত ব্ল্যাকস্টোন খেলা দেখিয়ে গেছেন। মঞ্চ-ম্যাজিকের ক্ষেত্রে নতুন বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার উদ্ভাবন করেন তিনি। ব্ল্যাকস্টোন যখন খেলা দেখাচ্ছেন তখন আর-একজন জাদুকর ব্ল্যাকস্টোনের জনপ্রিয়তাকেও ছাপিয়ে যান। তিনি হ্যারি হুডিনি। যাঁর ম্যাজিকের কথা প্রথমেই বলেছি। ১৮৭৪ সালের ২৪ মার্চ বুদাপেস্টে জন্মেছিলেন তিনি। সুদর্শন হুডিনি ছোটবেলা থেকেই নানারকম ম্যাজিক দেখানো শুরু করেন। বহু উল্লেখযোগ্য ম্যাজিক দেখিয়ে তিনি কিংবদন্তি হয়ে আছেন। হুডিনি খেলা শুরু করতেন চমৎকারভাবে। মঞ্চের পরদা খুললে আলোর সামনে এসে দাঁড়াতেন হুডিনি। কালো প্যান্ট, টাইট কোট আর লম্বা টুপি-মাথায় হুডিনি দর্শকদের দু-চারটি কথা বলে মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানাতেন,। অভিবাদনে হুডিনির মাথাটা ঝুঁকে যেত কিন্তু টুপিটা উঠে যেত শূন্যে। এভাবে সকলকে অবাক করে দিয়ে পরের খেলা শুরু করতেন তিনি।

ষাটের দশকে সিগফ্রিড ও রয়, মঞ্চে একটা সিংহ,একটা চিতা, একটা লেপার্ড ও একটা বাঘকে অদৃশ্য করেন। পরে নিজেও অদৃশ্য হন। অদৃশ্য করার খেলা ম্যাজিকের ইতিহাসে বারেবারে এসেছে।
নিউ ইয়র্কে ডাগ হেনিং ১৯৭৪ সালে শুধুমাত্র যন্ত্রের সাহায্যে ম্যাজিক দেখিয়ে রেকর্ড সৃষ্টি করেন। এরকম চমকপ্রদ ম্যাজিক এখন পৃথিবীর নানা প্রান্তে নিয়মিত দেখানো হচ্ছে। যেমন, ডাচ জাদুকর টেল স্মিথ তাঁর আঙুলের মাথা থেকে আগুন বের করার খেলা দেখান—অথচ পুড়ে যাওয়া দূরে থাক, আঙুলে সামান্য দাগও লাগে না। এই জাদুকরদের জন্য হলিউডে তৈরি হয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ম্যাজিক ক্যাসেল ক্লাব। বিল আর মিল্ট লারসেন নামে দুই ভাই এর প্রতিষ্ঠাতা। এটি সারা পৃথিবীর জাদুকরদের অন্যতম একটি কেন্দ্র।
ম্যাজিকের দেশ হল মিশর। তার কারণ, ম্যাজিকের ইতিহাসে মিশরের ঐতিহ্য প্রাচীন। পিরামিড, মমি, চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতিতে যেমন আশ্চর্য উন্নতি করেছিল প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা, তেমনই ম্যাজিকেও। তাঁদের জীবনযাপনেই রহস্য জড়িয়ে থাকত। মমির রহস্য কিংবা চিকিৎসাশাস্ত্রের নানা কৌশল গোপন রাখতেন তাঁরা। পিরামিডগুলো তো এক-একটি রহস্যের ভাণ্ডার। গোলকধাঁধার মতো ছোট-বড় নানা জটিল পদ্ধতিতে তৈরি ঘরগুলোর মধ্যে থাকত রাজা-রাজড়াদের মমি, ধনরত্ন। এভাবে রহস্যময় করে সমস্ত কিছুকে ব্যবহার করবার মানসিকতা দেখে সহজেই বোঝা যায়, তাঁরা ম্যাজিকে কেন এত উৎসাহী ছিলেন। কারণ, ম্যাজিকেরও অন্যতম বৈশিষ্ট্য 'রহস্য'। দীর্ঘকাল মিশরে ম্যাজিকের চর্চা হয়েছে ব্যাপকভাবে। বহু ম্যাজিক ক্লাবও গড়ে উঠেছিল গত শতকের শেষদিকে। তবে, এখন আর মিশরে সেভাবে ম্যাজিকের চর্চা হয় না।
ঠিক একই কথা বলা যায় চিনের ক্ষেত্রেও। রাজাদের সময়ে নানা জাদুকর যথেষ্ট নাম করেছিলেন ম্যাজিক দেখিয়ে। মঞ্চের মধ্যে চিনা ড্রাগনের লড়াই এবং ভয়ঙ্কর সেই কৃত্রিম ড্রাগনকে অদৃশ্য করার খেলা দেখাতেন জাদুকররা। তারপর উনিশ শতকের প্রথমদিকে সুরেলা বাজনা বাজিয়ে, গান শুনিয়ে ম্যাজিক দেখাতেন চিনা জাদুকররা। কিন্তু চল্লিশের দশক থেকে জাদুকররা ম্যাজিকে আর তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত রাখতে পারছিলেন না। এভাবেই চিনে ম্যাজিকের চর্চা জনপ্রিয়তা হারায়।

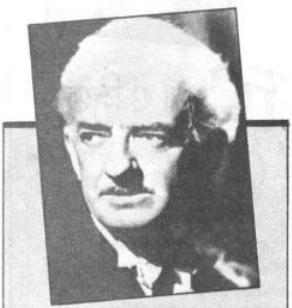

১৯৩৪ সালে ইংল্যান্ডে জাদুকর করাচি দেখিয়েছিলেন 'ইন্ডিয়ান রোপ ট্রিক'-এর খেলা। শিল্পীর কল্পনায়

জাদুকরের উপস্থিত বুদ্ধি

ইলিনয়িস শহরের ডেকাটুর অঞ্চলের একটি হল। তিন হাজার দর্শকের সামনে খেলা দেখাচ্ছিলেন আমেরিকার বিখ্যাত জাদুকর ব্ল্যাকস্টোন। এমন সময় খবর পেলেন, মঞ্চের পেছনের ঘরে আগুন লেগেছে। তিনি নাকে ধোঁয়ার গন্ধও পেলেন। সঙ্গে-সঙ্গেই স্থির বুদ্ধিতে এই সঙ্কট এড়ানোর উপায় ঠিক করে ফেললেন। অত্যন্ত শান্ত সুরে দর্শকদের উদ্দেশে বললেন, "এখন আমি অত্যাশ্চর্য 'ভারতীয় দড়ির খেলা'টি হলের বাইরে মুক্ত আকাশের নীচে দেখাব। তাই প্রস্তুতির জন্য আগেভাগে একটু ধোঁয়ার ব্যবস্থা করেছি। আপনারা সুশৃঙ্খলভাবে লাইন দিয়ে আমার সঙ্গে বেরিয়ে আসুন।" জাদুকরের পেছনে-পেছনে দর্শকরা বাইরে চলে এলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই আগুনের শিখা সমগ্র হলটিকে গ্রাস করে ফেলল। ব্ল্যাকস্টোনের উপস্থিত বুদ্ধিতে বহু প্রাণ বেঁচে গেল। পরের দিন আমেরিকার সমস্ত খবরের কাগজে ছাপা হল এই কাহিনী।

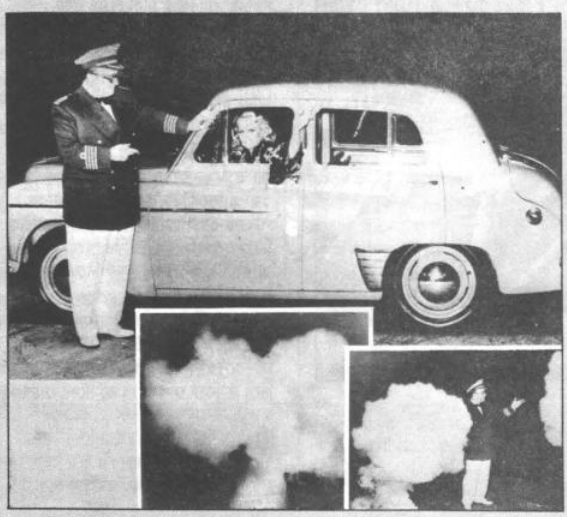

কালানাগ-এর খেলা

জার্মান জাদুকর কালানাগ (হেলমুট সচ্‌রিবার, ১৮৯৩-১৯৬৩), মোটরগাড়ি অদৃশ্য হওয়ার ম্যাজিক দেখাতেন। মঞ্চে একটা ঝকঝকে সুন্দর মডেলের মোটরগাড়ি এসে দাঁড়াত। ভেতরে বসে থাকতেন চালক। মোটরগাড়িতে চাপবার জন্য তিনি,তাঁর স্ত্রী ও সহকর্মী গ্লোরিয়ার কাছ থেকে বিদায় নিতেন। আর ঠিক সেই সময় মঞ্চের মাঝখানে বিরাট একটা ধোঁয়ার সৃষ্টি করে মোটরগাড়ি অদৃশ্য হয়ে যেত।

(প্রতুলচন্দ্র সরকার)। তিনি প্যারিসে আর নিউ ইয়র্কের রাস্তায় চোখ বাঁধা অবস্থায় সাইকেল চালিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিলেন। একবার চিনে, রেললাইনে পুলিশের হাতকড়া পরিয়ে তাঁকে বেঁধে রাখা হয়। সামনে থেকে ছুটে আসে দ্রুতগামী একটি ট্রেন। কিন্তু সকলের চোখকে ফাঁকি দিয়ে মাত্র ৩৮ সেকেণ্ডের মধ্যে বেরিয়ে আসেন তিনি। রাজা-বাদশার মতো জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক, মাথায় সাদা পালক দেওয়া পাগড়ি, উন্নত মানের আলো, সুন্দর মঞ্চসজ্জা আর গল্পের মধ্যে দিয়ে ম্যাজিক দেখানোর পদ্ধতি এ-দেশে তিনিই প্রথম চালু করেন। তিনি তাঁর ম্যাজিকের নাম দেন 'ইন্দ্রজাল'।

উড়ন্ত আসনে বসে জেন এবং এমারসন

ম্যাজিকের কথা বলতে গেলে ভারতের কথা বলতেই হয়। বিদেশীদের ধারণায় ভারত হল রূপকথা এবং কিংবদন্তির দেশ। এদেশে জাদুবিদ্যা ও তন্ত্রমন্ত্রের চর্চা সাধারণ মানুষের মধ্যেও প্রচলিত ছিল বলে তাঁদের অনেকের ধারণা। কথাটা পুরোপুরি সত্যি না হলেও, বহুদিন থেকেই আমাদের দেশে ভেলকি দেখানোর প্রচলন ছিল। মুঘল দরবারেও কয়েকজন বাঙালি জাদুকর জাদু দেখিয়ে দিল্লির বাদশাহকে অবাক করে দিয়েছিলেন। সেই সমস্ত প্রাচীন ঘটনার কথা লোকমুখেই বেশি প্রচলিত ছিল। যেমন, একটি ছিল 'ইন্ডিয়ান রোপ ট্রিক'।

কিন্তু পুরনো দিনের ম্যাজিক দিয়ে তো আর আজকের দিনের দেশ-বিদেশের দর্শকদের মন ভরানো যাবে না। এই সহজ কথাটি বুঝেছিলেন বলেই, নতুনভাবে ম্যাজিককে সাজিয়ে নিয়ে ভারতের নামটি বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিলেন জাদুসম্রাট পি.সি.সরকার

মার্ক উইলসন তাঁর শরীরটি দু'খণ্ড করে ভরেছেন দুটি খেলনা এঞ্জিনের মধ্যে।

চোখ বেঁধে

পি. সি. সরকার চোখ বেঁধে সাইকেল চালিয়েছিলেন। জন মার্শাল ঠিক একইভাবে চোখ বেঁধে মোটরগাড়ি চালিয়েছিলেন। মোটরগাড়ি চালানোর সমস্যা অনেক বেশি, সাইকেলের চেয়ে। খুব ভালভাবে চোখ বেঁধে, মুখ ঢেকে মার্শাল একটা গোল বৃত্তের চারপাশে বেশ গর্বের সঙ্গে ঘুরেছিলেন। ঘাস এবং খড় রাস্তায় ফেলে বাধার সৃষ্টি করা হচ্ছিল। কিন্তু প্রতিটি বাধাই জন মার্শাল অতি সহজেই অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন।

জাদুকর ডেভিড কপারফিল্ড অনেক উঁচুতে শূন্যে ভাসিয়েছেন সহকারিণীকে

পৃথিবীবিখ্যাত ম্যাজিকের 'নোবল প্রাইজ' দ্য ফিনিক্স অ্যাওয়ার্ড দু'বার পান তিনি।

আর-একজন বড় জাদুকর গোগিয়া পাশা (১৯১০-১৯৭৬) বহু নতুন-নতুন ম্যাজিকের আবিষ্কার করেন ও খ্যাতিলাভ করেন।

জাদুসম্রাট পি.সি.সরকারের পুত্র জুনিয়ার পি. সি. সরকার (প্রদীপচন্দ্র সরকার) আরও উন্নত ব্যবস্থায় ম্যাজিক দেখিয়ে সারা পৃথিবীতে খ্যাতি অর্জন করেছেন।

১৯৮৯ সালে জুনিয়ার পি.সি.সরকারের পরিকল্পনায় 'গিলি-গিলি-গো' নামে ম্যাজিক নিয়ে একটি সিনেমা তৈরি হয়েছে বাংলায়। এ-দেশে সম্পূর্ণ ম্যাজিক নিয়ে এরকম ছবি আগে তৈরি হয়নি।

খুব কমবয়সী জাদুকরদের মধ্যে জেরমি ডেন বেশ নাম করেছেন ইউরোপে। এই তরুণ জাদুকরের বৈশিষ্ট্য হল—হাসির ঘটনার মধ্যে দিয়ে ম্যাজিক দেখানো। আমাদের দেশেও কমবয়সী জাদুকর হিসেবে যথেষ্ট নাম করেছেন পিটার প্যান। ছদ্মনামের আড়ালে বাঙালি এই কিশোর জাদুকর ৭-৮ বছর বয়স থেকেই ম্যাজিক দেখিয়ে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন।

ম্যাজিক দেখানোর নেশাটা এরকম ছোটবেলায় অনেককেই পেয়ে বসে। কিন্তু "ম্যাজিক জানলেই ম্যাজিশিয়ান হওয়া যায় না।" ম্যাজিক দেখাতে গেলে চাই আরও কিছু দক্ষতা। যেমন, উপস্থিত বুদ্ধি, সুন্দর কথা বলার ক্ষমতা, অঙ্গভঙ্গির মধ্যেও সুন্দর একটি মাত্রা থাকা চাই। আর চাই সমস্ত খেলাটির মধ্যেই উন্নত একটা রুচির পরিচয়। সুরুচির ছাপ থাকলেই দর্শকেরা সেই জাদুকরের খেলায় আনন্দ পান।

হ্যারি কেলার 'ফ্লাইং কার্ডস' নামে সামান্য সময়ের একটি ম্যাজিক দেখানোর জন্য টানা ছ' বছর অনুশীলন চালান। খেলাটি ছিল ৫২টি তাসকে পিয়ানো অ্যাকর্ডিয়ানের মতো করে বাজানো, শূন্যে ঘুরিয়ে উলটো করে নেওয়া এবং প্রচণ্ড পাখার হাওয়ার মধ্যেও সমস্ত তাসকে নিজের হাতের আয়ত্তে রাখা। একে সম্পূর্ণভাবে ম্যাজিক না বলে, বলা যেতে পারে জাগলিং। নানারকম রসায়নের ব্যাপার ও জাগলিং এখন ম্যাজিকের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। এতে ম্যাজিক হয়েছে আরও চমকপ্রদ, আরও আকর্ষক।

ম্যাজিক সম্বন্ধে শেষ কথাটি বলেছেন হুডিনি, "ম্যাজিক হল চালাক লোকেদের জন্য বোকা আনন্দ, কিংবা বোকা লোকেদের জন্য চালাক আনন্দ।"

ম্যাজিক ও ম্যাজিশিয়ান

ম্যাজিকের মতো ম্যাজিশিয়ানদের জীবনও কম বিস্ময়কর নয়। কয়েকজন ম্যাজিশিয়ানের কথা লিখেছেন দীপক রায়

খোলা আকাশের নীচে ফাঁকা মাঠে দাঁড়িয়ে জাদুকর একটি লম্বা দড়ির এক মাথা আকাশের দিকে লক্ষ্য করে সজোরে ছুঁড়ে দিলেন। দড়িটি পড়ে না গিয়ে শূন্যে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। যেন শূন্যে অদৃশ্য কেউ শক্ত হাতে দড়ির মাথাটিকে ধরে আছে, বা অদৃশ্য কোনও উঁচু গাছের ডালে দড়ির মাথাটি বাঁধা হয়ে গিয়েছে। জাদুকরকে ঘিরে দাঁড়িয়ে-থাকা দর্শকরা তা দেখে বেমালুম অদৃশ্য হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর আকাশে জাদুকরের হুঙ্কার আর ছেলেটির আর্তনাদ শুনে নীচে দাঁড়িয়ে থাকা দর্শকরা আতঙ্কে শিউরে উঠল। এর পর শূন্য থেকে ছেলেটির রক্তমাখা কাটা হাত, পা, মাথা, ধড় ইত্যাদি পড়তে লাগল। কিছুক্ষণ পর জাদুকর দড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলেন। ছেলেটির দেহের ছিন্নভিন্ন অংশগুলি একটি ঝুড়িতে ভরে ডালা বন্ধ করে দিলেন এবং নানারকম

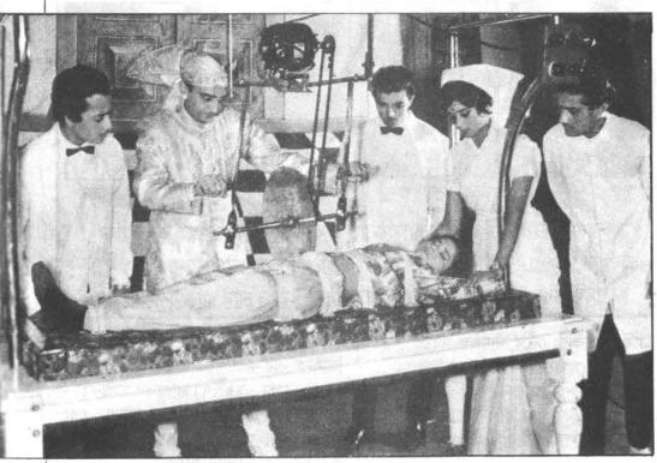

বৈদ্যুতিক করাতে সহকারিণীকে দ্বিখণ্ডিত করছেন জাদুকর কে· লাল

হতবাক ! দড়িটা নীচে পড়ে না গিয়ে শূন্যে ওভাবে দাঁড়িয়ে আছে কী করে ! তারপর জাদুকরের হুকুমে তাঁর সহকারী একটি ন-দশ বছরের ছেলে দড়িটি বেয়ে শেষপ্রান্তে পৌঁছে সবাইকে আরও অবাক করে দিয়ে শূন্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। জাদুকরের শত শাসানি এবং অনুরোধেও সে নীচে নেমে এল না। জাদুকর তখন ভীষণ রেগে গিয়ে একটি লম্বা ছুরি দু'পাটি দাঁতের মাঝখানে চেপে ধরে দড়ি বেয়ে দড়ির ডগায় পৌঁছে ছেলেটির মতোই জাদুমন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলেন। একটু পরেই ঝুড়ির ডালা খুলে ছেলেটি সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় হাসতে-হাসতে বেরিয়ে এল। বিশ্বের সবচেয়ে বিখ্যাত জাদুর খেলা 'ইন্ডিয়ান রোপ ট্রিক' অর্থাৎ ভারতীয় দড়ির খেলা। খেলাটি কিংবদন্তি মাত্র, তার কোনও বাস্তব ভিত্তি নেই।

উইল ডেক্সটার, মার্কো পোলো, ইবন বতুতা প্রমুখ বিদেশী লেখক তাঁদের গ্রন্থে ভারতীয় এই দড়ির খেলাটির বর্ণনা করেছেন এবং এঁরা সকলেই শেষ পর্যন্ত খেলাটির বাস্তব ভিত্তি সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। অথচ জাহাঙ্গিরের আত্মজীবনীতে উল্লেখ আছে, কয়েকজন বাঙালি জাদুকর নাকি তাঁর রাজসভায় গিয়ে এই খেলাটি তাঁকে দেখিয়েছিলেন। সেখানে যে বর্ণনা দেওয়া আছে তা পড়ে অবশ্য অবিশ্বাস্য, আজগুবিই মনে হয়।

পরবর্তীকালে হলের ভেতরে মঞ্চের ওপরে নানারকম যান্ত্রিক সুবিধা নিয়ে এই খেলাটি দেখিয়েছিলেন—হোরেস গোল্ডিন, সেসিল লাইল, থার্স্টন, ম্যাসোনি প্রমুখ।

আমাদের দেশের নানা জায়গায় ভ্রাম্যমাণ জাদুকরের দল, যাঁরা 'মাদারি' নামে পরিচিত, তাঁরাই খাঁটি ভারতীয় জাদু প্রদর্শন করতেন। উন্মুক্ত আকাশের নীচে —ফাঁকা মাঠে-ময়দানে কিংবা রাস্তার পাশে মাদারিরা চারদিকে দর্শক-পরিবৃত হয়ে জাদুর খেলা

জাদুসম্রাট

পরনে মহারাজার পোশাক, মাথায় পালক লাগানো পাগড়ি, পায়ে নাগরা জুতো—জমকালো এই পোশাক পরে আমেরিকার শিকাগো শহরের রাস্তায়-রাস্তায় পি· সি· সরকারকে ঘুরে বেড়াতে দেখে একবার একজন তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, "আপনি তো ভারতের একজন সাধারণ নাগরিক। তবে রাজবেশ পরেন কেন ?" পি· সি· সরকার প্রশ্নকর্তার চোখের দিকে তাকিয়ে সরাসরি বলেছিলেন, "তার কারণ, আমি জাদুসম্রাট।" এই ঘটনার পরে পি· সি· সরকারকে এ-বিষয়ে আর কেউ কখনও প্রশ্ন করেননি।

দেখাতেন। তাঁদের বড় খেলা ছিল 'ইন্ডিয়ান বাস্কেট ট্রিক' অর্থাৎ ভারতীয় ঝুড়ির খেলা এবং 'ইন্ডিয়ান ম্যাঙ্গো ট্রিক' অর্থাৎ ভারতীয় আমগাছের খেলা'। এখনও এগুলি বিশ্ববিখ্যাত হয়ে আছে। তাঁদের দেখানো চমকপ্রদ 'বাটি এবং গুটির খেলা'-টি পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো জাদুর খেলা। প্রাচীন রোম, মিশর ও গ্রিসে দেখানো হত বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। এ-খেলার উপকরণ তিনটি বাটি ও তিনটি গুটি। গুটিগুলি অতি দ্রুত এক বাটির তলা থেকে অন্য বাটির তলায় অদৃশ্যভাবে যাতায়াত করতে-করতে আলু, পেঁয়াজ, লেবু, আপেল কিংবা জীবন্ত পাখিতে রূপান্তরিত হয়। নানাজন নানাভাবে খেলাটি দেখাতেন।

জাদুর দেশ ভারতবর্ষে আধুনিক জাদুবিদ্যার জনক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন গণপতি চক্রবর্তী (জন্ম : ১৮৫৮, মৃত্যু : ১৯৩৯)। বাংলা তথা ভারতের জাদুজগৎ গণপতির কাছে বিশেষভাবে ঋণী। সর্বপ্রথম তাঁরই জাদুপ্রদর্শন জনসাধারণের কল্পনাকে ব্যাপকভাবে মাতিয়ে তুলেছিল।

গণপতি চক্রবর্তী জমিদার পরিবারের সন্তান। শ্রীরামপুর চাতরা নিবাসী জমিদার ছিলেন তাঁর পিতৃদেব। ছোটবেলায় পড়াশোনায় মন ছিল না—ঝোঁক ছিল গান-বাজনা আর ভেলকিওয়ালাদের ভোজবাজিতে। লেখাপড়া না শিখলে তাঁকে জমিদারি দেওয়া হবে না—এরকম ভয় দেখালে তিনি বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে আসেন। ঘুরে বেড়ান ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের সাধু-সন্ন্যাসী, ওঝা-গুনিন ও জাদুকরদের সঙ্গে।

শেষে গণপতি সেকালের ভারতবিখ্যাত 'বোসেস সার্কাস'-এ যোগ দেন এবং সার্কাসি খেলার ফাঁকে-ফাঁকে ফাউ হিসেবে মজাদার জাদুর খেলা দেখিয়ে দর্শকদের তাক লাগাতে থাকেন। ক্রমে-ক্রমে সার্কাসের জনপ্রিয় শিল্পী হয়ে উঠলেন গণপতি। তিনি যখন 'ইলিউশন বক্স', 'ইলিউশন ট্রি', ও 'কংস কারাগার' খেলা তিনটি দেখাতে শুরু করলেন, তখন তিনিই বোসের সার্কাসের সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। সার্কাসের সেরা খেলাগুলি নিষ্প্রভ হয়ে গেল গণপতির অবিশ্বাস্য, আশ্চর্য খেলাগুলির কাছে। গণপতির অসাধারণ সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হলেন সার্কাসের অন্য বিখ্যাত শিল্পীরা।

১৯১৩ সালে গণপতি সার্কাসের দল ছেড়ে দিয়ে নিজেই স্বাধীনভাবে জাদু প্রদর্শনের জন্য দল গড়লেন।

পলায়নী জাদুর খেলায় (ইংরেজি পরিভাষায় যার নাম Escape) বিশ্বের জাদুচর্চার ইতিহাসে সেরা শিল্পীরূপে অমর হয়ে আছেন মার্কিন ইহুদি জাদুকর হ্যারি হুডিনি (জন্ম : ১৮৭৪, মৃত্যু : ১৯২৬)। সে-কারণেই কেউ-কেউ গণপতিকে 'ভারতের হুডিনি' আখ্যা দিয়েছিলেন। তিনিই বাংলার জাদুর খ্যাতি সারা ভারতে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং প্রথম প্রমাণ করেছিলেন, জাদু-প্রদর্শন অর্থকরী পেশা। তিনিই বাংলাভাষায় সর্বপ্রথম 'জাদুবিদ্যা' নামে জাদুশিক্ষার একটি বইও লিখেছিলেন।

গণপতির সমসাময়িক দু'জন অসাধারণ বাঙালি জাদুকর—রাজা বোস এবং 'রয় দ্য মিস্টিক'। ১৯০৫ সালে মাত্র আঠারো বছর বয়সে লিড্‌স্ ইউনিভার্সিটিতে চামড়ার কাজ শিখতে বিলেতে গিয়েছিলেন রাজা পেস (জন্ম : ১৮৮৬, মৃত্যু : ১৯৪৮)। ছোটবেলায় ম্যাজিকের নেশা ছিল। বিদেশে ম্যাজিকের কদর দেখে, ম্যাজিক নিয়েই মেতে উঠলেন। সেখানে বিখ্যাত জাদুকরের স্বীকৃতিও আদায় করলেন তিনি। রাজা বোসের পিতৃদত্ত নাম রিপেন বোস। ইংল্যান্ডের পেশাদারি মঞ্চে সাফল্য পাওয়ার জন্য তাঁর ইম্প্রেসারিও মঞ্চ-নাম নথিভুক্ত করিয়ে দিলেন 'রাজা'।

ইংল্যান্ডের পেশাদারি ম্যাজিকের জগতে কয়েক বছর সাফল্যের সঙ্গে ম্যাজিক দেখিয়ে প্রচুর খ্যাতি, অর্থ ও অভিজ্ঞতা নিয়ে রাজা বোস কলকাতায় ফিরে এলেন। সঙ্গে নিয়ে এলেন কয়েকজন ইংরেজ সহকারী এবং জাদু-অভিজ্ঞ ইংরেজ পত্নী 'মিস হাইডি'-কে।

পত্নীর সঙ্গে রাজা বোস যেসব খেলা দেখাতেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'প্রিয়ার প্রত্যাবর্তন' এবং 'ভালুক ও শিকারির খেলা'। শেষের খেলাটি এইরকম : হাইডি দর্শকদের সামনে ভালুক সাজতেন। রাজা বোস শিকারির পোশাক পরে হাতে বন্দুক নিয়ে তাড়া করতেন ভালুকটিকে। মঞ্চের ওপর একটি নকল গাছের চারদিকে বারকয়েক দ্রুত ঘুরপাক খেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তেন ভালুকরূপী হাইডি ও শিকারিরূপী রাজা বোস। তারপর ভালুকের পোশাক খুলে বেরিয়ে আসতেন রাজা বোস। আর শিকারির পোশাক খুলে মিস হাইডি। গাছের গুঁড়ির সামান্য আড়ালে এত দ্রুত পরিবর্তন কীভাবে সম্ভব, তা ভেবে দর্শকরা অবাক হতেন!

কয়েক বছর এ-দেশে কাটিয়ে হাইডি ইংল্যান্ডে ফিরে যান। কারণ ভারতের আবহাওয়া তাঁর সহ্য হয়নি। হাইডি ফিরে গেলে বোসের জাদু-দলটি ভেঙে যায়। তিনি পেশাদারি মঞ্চ থেকে অবসর নেন।

রাজা বোসের পরেই মনে পড়ে 'রয় দ্য মিস্টিক'-এর কথা। রয় দ্য মিস্টিক (জন্ম : ১৮৯১, মৃত্যু : ১৯৭৭) ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্নিযুগে ইংরেজি কায়দায় এবং ইংরেজি পোশাকে সারা ভারতে জাদু-প্রদর্শন করতেন। তাঁর প্রধান কয়েকটি খেলা—বুদ্ধের আবির্ভাব, ভেন্ট্রিলোকুইজম, শূন্যে ভাসমান বালিকা, মেন্টাল টেলিপ্যাথি। বাংলার জাদু-জগতের আরও দু'জন বিশিষ্ট শিল্পী বিমল গুপ্ত ও তাঁর শিষ্য অশোক রায়। অশোক রায় (জন্ম : ১৯০৭, মৃত্যু : ১৯৮৬) পেশাদারি মঞ্চে জাদু-প্রদর্শন করতেন 'ওসাক রে' নামে। তিনি 'জাদুচক্র' নামে জাদুকরদের একটি সংস্থাও গঠন করেছিলেন। সেখানে জাদুশিক্ষার্থী সভ্যদের হাতে-কলমে জাদু শেখাতেন অশোক রায় নিজে এবং বিশিষ্ট শৌখিন জাদুকর বাঁশরী বন্দ্যোপাধ্যায়।

গণপতি চক্রবর্তী | অনিন্দ্যকিশোর গোস্বামী | গৌতম গুহ | শৈলেশ্বর মুখোপাধ্যায়

জাদুর দেশ ভারতবর্ষে আধুনিক জাদুবিদ্যার জনক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন গণপতি চক্রবর্তী। বাংলা তথা ভারতের জাদুজগৎ গণপতির কাছে বিশেষভাবে ঋণী। সর্বপ্রথম তাঁরই জাদুপ্রদর্শন জনসাধারণের কল্পনাকে ব্যাপকভাবে মাতিয়ে তুলেছিল।

বাংলায় বিজ্ঞানসম্মত জাদুশিক্ষার বই 'যাদুবিজ্ঞান' অশোক রায়েরই লেখা। তিনি 'যাদু' নামে একটি পত্রিকাও দশ বছর ধরে প্রকাশ করেন।

এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে আর-একজন সফল বাঙালি জাদুকর ছিলেন গঙ্গানারায়ণ সেনগুপ্ত। বন্দুক থেকে ছোঁড়া বুলেট দু'পাটি দাঁতের মাঝখানে ধরার খেলাটি তিনি অসামান্য দক্ষতায় দেখাতেন। বিস্ময়কর চিনা জাদুকর চুং লিং সু এই খেলাটি দেখাতে গিয়ে ১৯১৮ সালে মারা যান।

গঙ্গানারায়ণ সেনগুপ্তের পুত্র কে.এন. সেনগুপ্তও এই শতাব্দীর একজন উল্লেখযোগ্য জাদুকর। তাঁর সমসাময়িক কেসি, অবনী ব্যানার্জি, শান্তিরঞ্জন দাশগুপ্ত, সুশীল মুখোপাধ্যায়, এস মাধব, হিমাংশুশেখর চৌধুরী প্রমুখ হস্তকৌশলপ্রধান ম্যাজিকে বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছেন।

অসাধারণ।

জাদুসূর্য দেবকুমারের 'মিরাকলস্ অব ইন্ডিয়া' নামের জাদুপ্রদর্শনীটিকে বিরাট ও বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে পি.সি.সরকারের 'ইন্দ্রজাল' প্রদর্শনীর সঙ্গে তুলনা করা হত। মাত্র ১৩ বছর বয়সেই 'এক্স-রে আইজ' খেলাটি দেখিয়ে দেবকুমার রীতিমত সাড়া জাগান। ভারতীয় জাদুচর্চার ইতিহাসে পি.সি. সরকারের যুগকেই 'জাদুর স্বর্ণযুগ' বলা চলে।

বিশিষ্ট মার্কিন ভূ-পর্যটক জাদুকর এবং লেখক জন বুথ ১৯৪৮ সালে ভারত সফরে এসে এডি যোসেফ ও পি.সি.সরকারসহ কয়েকজন ভারতীয় জাদুকরের খেলা দেখে ফিরে গিয়ে তাঁর একটি বইয়ে লিখেছিলেন, 'ভারতীয় জাদুকরদের আতিথেয়তা তুলনাহীন। কিন্তু তাঁদের দেখানো জাদুর খেলাগুলি বহু শতাব্দীর পুরনো।'

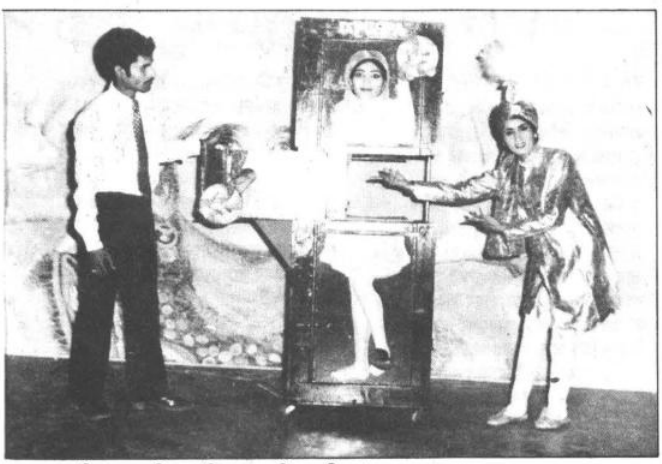

মহিলা জাদুকর ডি.পুষ্পা 'জিগ-জাগ লেডি' খেলাটি দেখাচ্ছেন

সেকালের জাদুসম্রাট গণপতি চক্রবর্তীর জাদুপ্রদর্শন দেখে জাদুচর্চায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তিনজন বাঙালি—প্রতুলচন্দ্র সরকার, দুলালচন্দ্র দত্ত এবং দেবকুমার ঘোষাল। যাঁরা পরবর্তীকালে পি সি সরকার, ডি সি দত্ত ও দেবকুমার নামে খ্যাতিলাভ করেন। জাদুপ্রভাকর ডি সি দত্ত ১৯৭৯ সালে ৬৬ বছর বয়সে কলকাতার মহাজাতি সদনে 'মহিষাসুরমর্দিনী' জাদুনাট্য মঞ্চস্থ করেন। নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী ছিলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। এককথায় এই নাট্য-পরিকল্পনাটি ছিল

জন বুথের সমালোচনায় ক্ষুণ্ণ না হয়ে পি.সি. সরকার ভারতীয় জাদুপ্রদর্শনে যুগান্তর এনে দিলেন। পাশ্চাত্য পোশাক ছেড়ে খাঁটি ভারতীয় রাজার পোশাকে, ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি অনুযায়ী প্রদর্শনীটিকে ভারতীয় রূপ দিলেন পি.সি.সরকার। প্রদর্শনীটির নামকরণ করলেন 'ইন্দ্রজাল'। আর তারপরেই পি.সি.সরকার তাঁর ইন্দ্রজাল প্রদর্শনী নিয়ে ঘুরে বেড়ান আমেরিকা, রাশিয়া, জাপান, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, জার্মানি, আফ্রিকা, স্কটল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি দেশে। বিদেশ থেকে তিনি যে পরিমাণ অর্থ ও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তাঁর আগে অন্য কোনও ভারতীয় শিল্পী তেমনটি পারেননি।

১৯৭১ সালের ৬ জানুয়ারি পি.সি.সরকার জাপানের হোক্কাইডো দ্বীপে ম্যাজিক দেখানোর সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। তাঁর জন্ম, ১৯১৩ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি, বাংলাদেশের টাঙ্গাইল মহকুমার অশোকপুর গ্রামে।

পি.সি.সরকারের আকস্মিক মৃত্যুতে, পিতার চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ করেছিলেন তাঁরই মধ্যম পুত্র প্রদীপচন্দ্র সরকার (পি.সি.সরকার, জুনিয়ার), তাঁর বয়স তখন মাত্র পঁচিশ (জন্ম : ১৯৪৬)।

সরকার জুনিয়ার তাঁর পিতার জায়গায়, পিতার পোশাকে ১৯৭১ সালে সেই যে জাদুপ্রদর্শন শুরু করেন, আজও তা সমান দক্ষতায়, নিরলস পরিশ্রমে দেখিয়ে চলেছেন দেশে-বিদেশে। পি.সি.সরকারের প্রায় সমসাময়িক তিনজন উল্লেখযোগ্য জাদুকর হলেন—এ.সি.সরকার (অতুলচন্দ্র সরকার, পি.সি.সরকারেরই ভাই), যোগী জাদুকর মৃণাল রায় ও কে.লাল (কাম্ভিলাল ভোরা)। তিনজনই পেশাদারি মঞ্চে বিশেষ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন এবং বিদেশে জাদুপ্রদর্শন করে বিদেশী স্বীকৃতিও পেয়েছেন। কে.লালের বয়স এখন ৬৫। কিন্তু এই বয়সেও তাঁর জাঁকজমকপূর্ণ ম্যাজিক সমান মুগ্ধ করে।

ভারতের জাদু-জগতে এখনও পর্যন্ত দু'জন মহিলা জাদুশিল্পী গৌরবের সঙ্গে জাদুপ্রদর্শন করেছেন। একজন হলেন উমা দাশগুপ্ত। দ্বিতীয়জন, ডি.পুষ্পা (শ্রীমতী পুষ্প দত্ত)। তিনি প্রথম জীবনে জাদুসম্রাট পি.সি. সরকারের সহকারিণী হিসেবে বিশ্বভ্রমণ করেন। পরে মৃণাল রায়ের 'মায়ামহল' প্রদর্শনীতেও কিছুদিন ছিলেন। তারপর তিনি স্বাধীনভাবে ম্যাজিক দেখানো শুরু করেন।

'জাদুর দেশ' এই ভারতে এখন কয়েকজন জাদুকরের নাম অনায়াসেই করা যায়—সুবীর সরকার, গৌতম গুহ, ফ্রাঙ্ক (দীপ্তেন বিশ্বাস), সমীরণ, করুণাশঙ্কর, প্রোফেসর প্যান, তাপস বসু, দীপক রায়চৌধুরী, এস.মুখার্জি, শৈলেশ্বর, প্রিন্স শীল, সুবাস প্রমুখ। এঁদের মধ্যে গৌতম গুহের সুনাম শুধু জাদুকর হিসেবেই নয়, জাদু-শিক্ষক হিসেবেও।

জাদুজগতের সর্বকনিষ্ঠ তিন শিল্পী—অনিন্দ্যকিশোর (অনিন্দ্যকিশোর গোস্বামী), এস.লাল (শঙ্করলাল রায়) ও বিক্রমাদিত্য (রাজকুমার মুখোপাধ্যায়)।

ম্যাজিকের গল্প

অবিস্মরণীয়

অজিতকৃষ্ণ বসু (অ· ক· ব·)

এই আশ্চর্য ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে, এবং ঘটনাটির বিবরণ লিখেছিলেন তখনকার দৈনিক সংবাদপত্র 'পায়োনিয়ার' (PIONEER) -এর একজন বিশেষ সংবাদদাতা। আমি এই কাহিনীটি পেয়েছি সেকালের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মনীষী আচার্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ইংরেজি মাসিকপত্র 'ডন' (DAWN)--এর ডিসেম্বর, ১৯০০ সংখ্যায়।

তখন ভারতবর্ষের বড়লাট ছিলেন লর্ড কার্জন, যিনি শাসনকার্যের সুবিধের জন্য বঙ্গদেশকে ভেঙে দু' ভাগে বিভক্ত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বাঙালিদের প্রচণ্ড বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের ফলে বঙ্গ তখন বিভক্ত হতে পারেনি।

লর্ড কার্জন তাঁর সহধর্মিণী লেডি কার্জন এবং দলবলসহ 'খেদা' অভিযানে কীভাবে বুনো হাতি ধরা হয় তাই দেখতে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁবুর তলায় দুপুরের খাওয়াদাওয়া সেরে তাঁরা বিশ্রাম করছেন, এমন সময় বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে নিয়ে আসা হল সাঙ্গোপাঙ্গসহ বড়লাট বাহাদুরের মনোরঞ্জনের জন্য। এই ব্রাহ্মণ এর আগে তাঁর অদ্ভুত স্মৃতিশক্তির খেলা দেখিয়ে দুই বড়লাট—লর্ড এলগিন এবং লর্ড ল্যান্সডাউনকে এবং আরও কয়েকজন উচ্চপদস্থ রাজপুরুষকেও বিস্ময়ে অভিভূত করেছিলেন। তাঁর অদ্ভুত ক্ষমতা এই যে, তিনি তাঁর মনের ভেতরে অদৃশ্য স্লেটে একবার যা লিখে রাখেন, তা কিছুতেই ভোলেন না। তাঁর এই ক্ষমতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেওয়ার জন্য তিনি লর্ড কার্জন, লেডি কার্জন, মেজর বেয়ারিং এবং মিস্টার লরেন্স—এই চারজনকে বললেন, "আপনারা প্রত্যেকে আপনাদের পছন্দমতো যে-কোনও ভাষায় যে-কোনও সংখ্যক শব্দ-যুক্ত একটি সম্পূর্ণ বাক্য মনে-মনে ভাবুন।"

তাঁরা তাই মনে-মনে ভাবলেন। লর্ড কার্জন ছিলেন গ্রিক ভাষায় সুপণ্ডিত, তিনি গ্রিক সাহিত্য থেকে একটি বিখ্যাত প্রবাদবাক্য মনে করলেন। লেডি কার্জন এবং মেজর বেয়ারিং বেছে নিলেন লিউইস ক্যারল-এর বিখ্যাত 'অ্যালিস ইন ওআন্ডারল্যান্ড' বই থেকে আজগুবি খাপছাড়া কবিতার বেশ শক্ত দুটি লাইন। মিস্টার লরেন্স মনে-মনে ভাবলেন একটি সাদাসিধে ধরনের ইংরেজি বাক্য। তাঁর নিজেরই বানানো।

স্মৃতিশক্তির জাদুকর ব্রাহ্মণ তখন বললেন, "আপনারা আপনাদের পছন্দ করা বাক্যের শব্দগুলো মাত্র একবার উচ্চারণ করে আমাকে শোনাবেন, আমি মাত্র একটিবার শুনেই নির্ভুলভাবে মনে গেঁথে রাখব। আপনাদের অবশ্যই মনে হতে পারে যে আপনারা চারজন যদি পর-পর আপনাদের নিজের পছন্দ করা পুরো বাক্যটি একটানা উচ্চারণ করে আমাকে শোনান বাক্যের শব্দগুলির ক্রমানুসার হুবহু বজায় রেখে, তা হলে বাক্যগুলো মনে রাখা আমার পক্ষে খুবই সহজ হবে। তাই ব্যাপারটাকে আমি অনেক বেশি জটিল আর কঠিন করে দিচ্ছি। আপনারা একজনের পর আর-একজন চক্রাকারে পালা করে একবারে শুধু নিজের বাক্যের যে-কোনও একটি শব্দ বলবেন, আর সঙ্গে-সঙ্গে আমাকে জানিয়ে দেবেন সেটি আপনার পছন্দ করা বাক্যের কত নম্বর শব্দ। আমি শোনামাত্র সেটি আমার মনে গেঁথে রাখব। এমনই এলোমেলোভাবে শব্দগুলো বলতে-বলতে যখন আপনাদের চারজনের প্রত্যেকের বাক্যের সব শব্দ বলা হয়ে যাবে, তারপর সেগুলো আমাকে আর শোনাতে হবে না। একবার শোনাই আমার পক্ষে যথেষ্ট হবে। কেমন, ব্যাপারটা অনেক বেশি কঠিন করে দিলাম কিনা ?"

এই ব্যবস্থার ফলে মনে রাখার কাজটা সত্যিই যে অনেক বেশি কঠিন হল, তা কিছু উদাহরণ থেকেই বোঝা যাবে। ধরা যাক, প্রথমেই লর্ড কার্জন একটি শব্দ উচ্চারণ করে জানালেন, "এটি আমার বাক্যের চার নম্বর শব্দ।" তারপর লেডি কার্জন শোনালেন, তাঁর বাক্যের দ্বিতীয় শব্দ। তারপর মেজর বেয়ারিং শোনালেন তাঁর বাক্যের ন' নম্বর শব্দটি। তারপর মিস্টার লরেন্স জানালেন, তাঁর

বাক্যের বারো নম্বর শব্দটি। তারপর ফিরে এল লর্ড কার্জনের পালা। তিনি বললেন, তাঁর বাক্যের সপ্তম শব্দটি কী। এরকম অত্যন্ত এলোমেলোভাবে শোনা শব্দগুলো অসাধারণ স্মৃতিশক্তির জোরে মনে-মনে গুছিয়ে নিয়ে চারটি বাক্য সঠিকভাবে শোনাতে হবে। সুতরাং সহজেই বোঝা যায় ব্যাপারটা রীতিমত শক্ত।

তার ওপর কর্নেল রবার্টসন চাপিয়ে দিলেন একটি বিরাট যোগ অঙ্কের বোঝা। ওপর থেকে নীচে দশটি লাইন, প্রত্যেক লাইনে দশটি ঘরের একটি বড় সংখ্যা।

বিরাট যোগ অঙ্কটি খুব যত্ন করে কষে তিনি তাঁর কাগজের ওপর দশ লাইন অঙ্কের তলায় একটি লাইন টেনে তার তলায় বিরাট যোগফলটি লিখে রেখেছিলেন। স্মরণশক্তি বিশারদ ব্রাহ্মণকে তিনি অঙ্কের পুরো দশটি লাইন একবার মাত্র পড়ে শুনিয়ে দিলেন। তাঁকে বললেন না শুধু বিরাট যোগফলটি। ব্রাহ্মণের স্মৃতিশক্তির ওপর এইসব বিরাট বোঝা চাপাবার পালা শেষ হল। ব্রাহ্মণ নিবিষ্ট মনে সব কিছু একবার, মাত্র একবার শুনে নিলেন।

তারপরই শুরু হল আশ্চর্য ব্রাহ্মণের বিস্ময় সৃষ্টির পালা। তিনি লর্ড বেয়ারিং আর মিস্টার লরেন্স-এর পছন্দ করা বাক্যগুলি অনর্গল নির্ভুলভাবে বলে দিলেন। লর্ড কার্জন বিস্ময়ে আর প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, ব্রাহ্মণ যখন তাঁর নির্বাচিত গ্রিক প্রবচনটি নির্ভুলভাবে, প্রতিটি শব্দ স্বয়ং লর্ড কার্জন যেভাবে উচ্চারণ করেছিলেন সেইভাবে উচ্চারণ করে বলে দিলেন। বাকি তিনজনের তিনটি বাক্যও ব্রাহ্মণটি নির্ভুলভাবে বলে দিয়ে তাঁদেরও তাক লাগিয়ে দিলেন।

তারপর কর্নেল রবার্টসনের পালা। তিনি যে বিরাট যোগ অঙ্কের লাইনগুলি পর-পর একবারমাত্র পড়ে ব্রাহ্মণকে শুনিয়েছিলেন, কিন্তু যোগফলটি বলেননি, ব্রাহ্মণ নির্ভুলভাবে আর একটুও ইতস্তত না করে, সেই লম্বা যোগফলটি বলে গেলেন। অঙ্ক কষেও এই যোগফলটি বের করতে অঙ্কবিশারদ কর্নেল রবার্টসনের আধঘণ্টারও বেশি সময় লেগেছিল কাগজ আর কলম নিয়ে।

সবাই ভীষণ বিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন, "এই আশ্চর্য ব্যাপার আপনি করলেন কী করে ?" স্মরণশক্তি বিশারদ ব্রাহ্মণ বললেন, "অতি সহজ-সরল উপায়ে। আপনাদের চারজনের জন্য আমার মনের বুকে বাঁ দিক থেকে ডান দিকে ওপর থেকে নীচে চারটি আলাদা সমান্তরাল রেখা টেনে নিয়েছিলাম। তারপর আপনাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে তাঁর বাক্যে কতগুলি শব্দ আছে জেনে নিয়ে তাঁর লাইনটিকে ঠিক ততগুলি ভাগে ভাগ করে নিয়েছিলাম। আপনারা যখন একটি করে শব্দ উচ্চারণ করে বলছিলেন ওই শব্দটি বাক্যের কত নম্বর শব্দ, আমি সঙ্গে-সঙ্গেই আমার মনের বুকে আঁকা লাইনের ওই নম্বর ভাগে শব্দটি বসিয়ে দিচ্ছিলাম। এইভাবে যখন চার লাইনের সব অংশেই শব্দ লেখা হয়ে গেল, তখন সেই লেখা আমি এমন স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছিলাম, যেন আমার চোখের সামনে কাগজে লেখা রয়েছে। আমি শুধু সেই লেখাগুলি পড়ে গিয়েছিলাম মাত্র। বাক্যগুলির মতো বড় যোগ অঙ্কটির বেলায়ও ঠিক তাই। ব্যাপারটা খুবই সরল। আপনারা যদি মনের বুকে লিখে রাখার, আর সেই লেখা স্পষ্টভাবে দেখে পড়ে যাওয়ার অভ্যাসটা ঠিকমতো রপ্ত করে নিতে পারেন, তা হলে আমি যা করে দেখালাম, আপনারাও তা করতে পারবেন।"

তারপর কয়েক বছর আগে বড়লাট লর্ড এলগিন আর লর্ড ল্যান্সডাউনের পছন্দ করা ফরাসি এবং জার্মান ভাষার যেসব বাক্য তাঁর অসাধারণ স্মৃতিশক্তির খেলায় ব্যবহৃত হয়েছিল, সেগুলিও স্মৃতি থেকে নির্ভুলভাবে আবৃত্তি করে প্রচুর প্রশংসা আর পুরস্কার নিয়ে ব্রাহ্মণ চলে গেলেন। যাঁরা তাঁর অদ্ভুত স্মৃতিশক্তির খেলা দেখে তখনও বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারেননি, তাঁরা একটু পরেই কৌতুকের সঙ্গে লক্ষ করলেন স্মৃতিশক্তির চ্যাম্পিয়ান ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাঁর হাতের লাঠিটি নিয়ে যেতে ভুলে গেছেন, সেটি টেবিলের ওপর পড়ে আছে !

ছবি : দেবাশিস দেব

কেরিয়ার গাইড

স্কুল অব প্ল্যানিং অ্যান্ড আর্কিটেকচার

স্থাপত্যবিদ্যা এবং নকশা রচনার পঠনপাঠনের ক্ষেত্রে নয়াদিল্লির স্কুল অব প্ল্যানিং অ্যান্ড আর্কিটেকচার এক উল্লেখযোগ্য নাম। দেশ-বিদেশে এখন এর খ্যাতি। প্রতি বছর এখানে পড়াশোনার জন্য অনেক বিদেশী ছাত্রছাত্রীও ভর্তি হয়। দিল্লি পলিটেকনিকের স্থাপত্যবিভাগ হিসেবে প্রতিষ্ঠানের সূচনা ১৯৪১ সালে। পরবর্তীকালে ভারত সরকার প্রতিষ্ঠিত স্কুল অব টাউন অ্যান্ড কান্ট্রি প্ল্যানিংয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে এই সংস্থা গ্রামীণ নগর এবং আঞ্চলিক নকশা রচনা শিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের অধিকারী হয়ে উঠেছে। এই স্কুলের প্রধান কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হল :

(১) এখানে স্থাপত্যবিদ্যায় স্নাতক, স্নাতকোত্তর এবং গবেষণা শিক্ষাক্রমের সবরকম সুযোগ আছে।

(২) ফিজিক্যাল প্ল্যানিং-এ স্নাতক পাঠক্রম এই প্রতিষ্ঠানটি প্রথম শুরু করেছে।

(৩) স্থাপত্যবিদ্যায় স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পাঠক্রমে এমন সব বিষয়ে এখানে পঠনপাঠনের সুযোগ আছে, যা অন্য কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নেই।

(৪) এই প্রতিষ্ঠানটি বাসস্থান সমস্যা সুরাহার জন্য গ্রামীণ উন্নয়ন, পরিবেশবিদ্যা, সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ এবং পদ্ধতিবিদ্যা বিষয়ক কেন্দ্র স্থাপন করেছেন।

এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির সূচনা দিল্লি পলিটেকনিকের আর্কিটেকচার বিভাগ হিসেবে, ১৯৪১ সালে। পরবর্তীকালে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় এই প্রতিষ্ঠানটিকে অনুমোদন দেন এবং এটি ভারত সরকার প্রতিষ্ঠিত স্কুল অব টাউন অ্যান্ড কান্ট্রি প্ল্যানিংয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। এখন দেশ-বিদেশে স্কুলের সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে। স্থাপত্যবিদ্যার সব শাখা নিয়েই পড়াশোনার সুযোগ আছে এখানে। স্থাপত্যবিদ্যার এমন অনেক বিষয় এখানে পড়ানো হয় যা নাকি এদেশে অন্য কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়ানো হয় না। নয়া দিল্লিতে এই শিক্ষায়তনটি অবস্থিত। স্থাপত্যবিদ্যার অধ্যয়ন এবং গবেষণার ক্ষেত্রে এর অবদান উল্লেখযোগ্য।

কী বিষয় পড়ানো হয়

প্ল্যানিং এবং আর্কিটেকচারের এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটিতে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর উভয় পাঠক্রমই পড়ানো হয়। যেমন (ক) ব্যাচেলর'স প্রোগ্রামস ইন আর্কিটেকচার অ্যান্ড ফিজিক্যাল প্ল্যানিং। (খ) মাস্টার'স প্রোগ্রামস ইন আরবান প্ল্যানিং, রিজিওনাল প্ল্যানিং, এনভায়রনমেন্টাল প্ল্যানিং, হাউজিং, ট্রান্সপোর্ট প্ল্যানিং, ল্যান্ডস্কেপ আর্কিটেকচার, আরবান ডিজাইন, আর্কিটেকচারাল কনজারভেশন অ্যান্ড বিল্ডিং এঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট।

ব্যাচেলর অব আর্কিটেকচার পাঠক্রমটি পাঁচ বছরের। ৬৮ জন ছাত্রছাত্রীকে ভর্তি করা হয়। এই পাঠক্রমে ডিজাইন এবং কনস্ট্রাকশন অব বিল্ডিং বিষয়ের নানা দিক নিয়ে শেখানো হয়, বিশেষ করে সামাজিক, প্রযুক্তিগত এবং পরিবেশগত আঙ্গিক বিষয়ের উপযুক্ততা নিয়ে পড়ানো হয়। বিভিন্ন পরিবেশে এবং পরিস্থিতির মধ্যে বাড়িঘর নির্মাণের প্রযুক্তি এবং কৌশল বিষয়ে শেখানো হয়। ফলে এখানকার ছাত্রছাত্রী ড্রয়িং, স্থাপত্য উপস্থাপনা, কারিগরি এবং ব্যবস্থাপনার সবদিকেই কুশলী হয়ে ওঠে এবং পরবর্তীকালে নিজেদের পছন্দমতো পেশা বেছে নিতে পারেন।

ব্যাচেলর অব ফিজিক্যাল প্ল্যানিং পাঠক্রমটিও পাঁচ বছর মেয়াদের। ২০ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়। স্থাপত্যশিল্পের নানা দিক বিবেচনা করে এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোয় প্রতিষ্ঠানটি ১৯৮৯-'৯০ শিক্ষাবর্ষ থেকে এই গুরুত্বপূর্ণ পাঠক্রমটি চালু করেছেন। বলতে গেলে, সারা দেশে এই নতুন পাঠক্রম প্রবর্তনের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি অন্যতম পথিকৃৎ। আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন এবং প্রযুক্তিবিদ্যার উত্তরোত্তর উন্নতির সঙ্গে তাল রেখে মানুষের বাসস্থান তৈরির পরিকল্পনার মধ্যেও আনতে হচ্ছে নানা পরিবর্তন। সেজন্যই ছোট-বড় সব শহরেই দরকার হচ্ছে ফিজিক্যাল প্ল্যানিংয়ের। এই পাঠক্রম শেষ করার পর ছাত্রছাত্রীরা এঞ্জিনিয়ার এবং আর্কিটেক্টের মতোই প্রোফেশনাল প্ল্যানার হিসেবে পরিগণিত হবেন। অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেকনিক্যাল এডুকেশন (AICTE) এবং ভারত সরকারের মানব সম্পদ মন্ত্রক এই পাঠক্রমটি অনুমোদন করেছেন।

শিক্ষাগত যোগ্যতা

আর্কিটেকচার এবং ফিজিক্যাল প্ল্যানিংয়ের ডিগ্রি কোর্সে ভর্তি হতে হলে প্রার্থীকে নতুন দিল্লির সেন্ট্রাল বোর্ড অব সেকেন্ডারি এডুকেশনের

অধীন সিনিয়ার স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় (১০+২ পর্যায়ের ১২ বছরের কোর্স) পাশ করতে হবে অথবা সমমানের স্বীকৃত পরীক্ষায় (যেমন আমাদের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা) পাশ করলেও চলবে। তবে আরও কয়েকটি শর্ত আছে। যেমন :

(ক) দশম পর্যায়ের পরীক্ষায় কেমিস্ট্রিসহ জেনারেল সায়েন্স বিষয় থাকা চাই।

(খ) ১০+২ পর্যায়ের পরীক্ষায় ইংরেজি, ফিজিক্স, ম্যাথমেটিক্স এবং একটি অপশোনাল (ঐচ্ছিক) বিষয়ে (যে বিষয়ে প্রার্থী সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছেন) এগ্রিগেটে কমপক্ষে শতকরা ৬০ নম্বর পেয়ে পাশ করে থাকতে হবে।

(গ) তফসিলি জাতি, উপজাতি, যুদ্ধে নিহত বা দৈহিক-অক্ষম সামরিক কর্মীর ছেলেমেয়ে, দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত নম্বরের হার হবে কমপক্ষে শতকরা ৫৫। তবে সংরক্ষিত আসনের প্রার্থীদের উপযুক্ত সার্টিফিকেট দেখাতে হবে।

(ঘ) লেখাপড়ায় পিছিয়ে থাকা রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রার্থীদের সংরক্ষিত আসনের জন্য ডোমিসাইল সার্টিফিকেট দিতে হবে। তা ছাড়া শিক্ষায়তনের অধ্যক্ষের সার্টিফিকেটও জমা দিতে হবে।

মনোনয়নের পদ্ধতি

আর্কিটেকচার এবং ফিজিক্যাল প্ল্যানিংয়ের ডিগ্রি কোর্সে ভর্তি হতে হলে প্রার্থীকে ভর্তির প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসতে হবে। এই প্রবেশিকা পরীক্ষা দুটো পর্যায়ে হয়। টেস্ট-১ এবং টেস্ট-২।

টেস্ট-১ পর্যায়ে থাকে জেনারেল নলেজ, স্কলাস্টিক পারফরম্যান্স এবং আই কিউ টেস্ট। এই টেস্ট-১ পরীক্ষা আর্কিটেকচার এবং ফিজিক্যাল প্ল্যানিং উভয় কোর্সের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এখন জানা দরকার, এই পর্যায়ের পরীক্ষায় কী ধরনের প্রশ্ন থাকে। মোটামুটিভাবে বলা যায়, এই পরীক্ষার মাধ্যমে তিনটি বিষয় বিচার করা হয়। প্রথমত, প্রার্থী তার পারিপার্শ্বিক জীবন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল কি না। এই বিষয়ে যাচাইয়ের জন্য প্রার্থীর এই বয়সে সাধারণত যেসব বিষয় জানা থাকা উচিত সেসব বিষয়েই প্রশ্ন করা হয়। দ্বিতীয়ত, প্রার্থীর পড়াশোনার ঝোঁক এবং আগ্রহ বিষয়ে খবর নেওয়া। স্কুল পর্যায়ে যেসব বিষয় নিয়ে তিনি পড়াশোনা করেছেন সেই বিষয়গুলিতে তাঁর জ্ঞান, অধীত বিদ্যা কাজে লাগানোর ক্ষমতা এবং সমস্যা সমাধানের নীতি বিষয়ে নানা ধরনের প্রশ্ন করা হয়। তৃতীয়ত, প্রার্থীর বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষা নেওয়া হয়। এই তিনরকম যাচাইয়ের পরীক্ষার সব প্রশ্নই করা হয় অবজেকটিভ ধরনের, কয়েকটি সম্ভাব্য উত্তরের মধ্যে সঠিক উত্তরটি বেছে নিতে হয়।

টেস্ট-২ পর্যায়ের পরীক্ষায় থাকে অ্যাপটিচুড টেস্ট। তবে আর্কিটেকচার এবং ফিজিক্যাল প্ল্যানিং ডিগ্রি কোর্সের প্রার্থীদের আলাদা-আলাদা অ্যাপটিচুড টেস্টে বসতে হয়। যাঁরা আর্কিটেকচার কোর্সে ভর্তি হতে চান তাঁদের তিন ধরনের অ্যাপটিচুড পরীক্ষা করা হয়। (ক) ভিসুয়াল অ্যান্ড স্পেশিয়াল (spatial) পারসেপসনস। (খ) ক্রিয়েটিভ এবিলিটি। (গ) এসথেটিক সেন্সিটিভিটি। এই পরীক্ষার মধ্যেই থাকে ফ্রি হ্যান্ড ড্রয়িং এবং অবজেক্ট কম্পোজিশন প্রভৃতি। ফিজিক্যাল প্ল্যানিং কোর্সের প্রার্থীদের অ্যাপটিচুড টেস্ট করা হয় তাঁদের পরিবেশ, সমাজ, বাসস্থান প্রভৃতি বিষয়ে সচেতনতা, লেখার ক্ষমতা, বোঝার ক্ষমতা প্রভৃতি নির্ণয় করার জন্য।

টেস্ট-১ পরীক্ষা নেওয়া হয় স্কুল অব প্ল্যানিং অ্যান্ড আর্কিটেকচার ভবনে এবং আরও কিছু অনুমোদিত কেন্দ্রে। প্রথম টেস্টে সফল প্রার্থীদের দ্বিতীয় টেস্টের জন্য ডাকা হয়। সাধারণত যত ছাত্র ভর্তি করা হয় তার পাঁচগুণ প্রার্থীকে প্রথম টেস্টে মনোনীত করা হয়। দ্বিতীয় টেস্ট নেওয়া হয় সংশ্লিষ্ট বিভাগে। জুলাই মাসের দ্বিতীয়

সপ্তাহ নাগাদ প্রথম টেস্ট গৃহীত হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় টেস্টের ফলাফলের শতকরা নম্বরের ভিত্তিতে চূড়ান্ত তালিকা তৈরি করা হয়। সাধারণত এই দুই পরীক্ষায় যাঁরা কমপক্ষে শতকরা ৫০ নম্বর (তফসিলিদের ক্ষেত্রে শতকরা ৪৫ নম্বর) পান। তাঁদের ভর্তির জন্য বিবেচনা তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

কীভাবে আবেদন করতে হবে

প্রতি বছর মে-জুন মাসে বিভিন্ন জাতীয় সংবাদপত্রে ভর্তির বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়। জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে ভর্তির প্রবেশিকা পরীক্ষা নেওয়া হয়। যেসব উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর ফলাফল বেরোয়নি, অথচ এই প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসতে আগ্রহী, তাঁরা শর্তসাপেক্ষে এই পরীক্ষায় বসতে পারেন, কিন্তু নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে তাঁদের পরীক্ষার মার্কশিট জমা দিতে হবে। জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহ নাগাদ ভর্তির ফাইনাল লিস্ট স্কুলের নোটিস বোর্ডে টাঙিয়ে দেওয়া হয়। নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে সমস্ত টাকাপয়সা জমা দিয়ে ভর্তি হতে হয়।

জেনে রাখা দরকার, শিক্ষাগত যোগ্যতার সঙ্গে-সঙ্গে প্রার্থীর বয়সের ব্যাপারটাও মাথায় রাখতে হবে। প্রার্থীকে ভর্তির বছরের ১ অক্টোবর তারিখে কিংবা তার আগে কমপক্ষে ১৭ বছর বয়সী হতে হবে।

ভর্তির জন্য আবেদনপত্র এবং তথ্যপুস্তিকা দিল্লির কতিপয় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের শাখা থেকে জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকেই কাউন্টারে নগদ পঞ্চাশ টাকার বিনিময়ে পাওয়া যায়। এ ছাড়া স্কুল থেকে ডাকযোগে সরাসরি আবেদনপত্র এবং তথ্যপুস্তিকা সংগ্রহ করা যেতে পারে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে। সেজন্য অনুরোধপত্রের সঙ্গে নয়া দিল্লির ইউকো ব্যাঙ্ক কিংবা স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার ওপর কাটা পঞ্চাশ টাকার রেখিত ব্যাঙ্ক ড্রাফট পাঠাতে হয়। রেজিস্ট্রারের ঠিকানায়। জুন মাসের শেষ সপ্তাহে বিজ্ঞাপিত সময়ের মধ্যে আবেদনপত্র জমা দিতে হয়। পত্রালাপ বা যোগাযোগের ঠিকানা : রেজিস্ট্রার, স্কুল অব প্ল্যানিং অ্যান্ড আর্কিটেকচার, ইন্দ্রপ্রস্থ এস্টেট, নয়া দিল্লি-১১০০০২।

পড়াশোনার খরচ

ভর্তির সময় একজন ছাত্রকে মোট এক হাজার টাকা জমা দিতে হয়। এর মধ্যে এনরোলমেন্ট ফি, টিউশন ফি (১৮০ টাকা), গেমস ফি (৪০ টাকা), মেডিকেল ফি, ম্যাগাজিন ফি, স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন ফি (১০০ টাকা), পরীক্ষার ফি (৬০ টাকা), সিকিউরিটি ডিপোজিট (ফেরতযোগ্য) ৫০০ টাকা অন্তর্ভুক্ত আছে। এ ছাড়া হস্টেলের জন্য জমা দিতে হয় ১৭০০ টাকা। ৩০০ টাকা ফার্নিচার ডিপোজিট, ৭০০ টাকা মেস ডিপোজিট, রুম রেন্ট (জল, বিদ্যুৎ সমেত) বাবদ ২০০ টাকা, হস্টেল মেস এমপ্লয়িজ এসটাবলিশমেন্ট চার্জ বাবদ ৫০০ টাকা।

ছবি : দেবাশিস দেব

টাকাকড়ি

মৌর্যোত্তর উত্তর ভারতের মুদ্রা

মৌর্যোত্তর যুগে ছাঁচে ঢালা বিভিন্ন আকারের তামার মুদ্রার বহুল প্রচলন হয়। জানিয়েছেন **ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়**.

অর্থশাস্ত্রে 'কাকণী' কথাটি শুধু এক শ্রেণীর মুদ্রার নাম হিসাবেই নয়, কপর্দক বা কড়ি অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। দ্বিতীয় অর্থে শব্দটির ব্যবহার বোধ হয় মৌর্যযুগের এক লেখ-তে দেখা যায়। মৌর্যযুগে সরকারি নিয়ন্ত্রণে বিস্তারিত ব্যবস্থা কিন্তু টাকার জালিয়াতি বন্ধ করতে পারেনি। রুপোর পাতে মোড়া বা বর্তমানে পাতের অনেকাংশ নষ্ট হয়ে যাওয়া অবস্থায় আবিষ্কৃত বহুসংখ্যক তামার কার্যাপণ তার প্রমাণ।

মৌর্যযুগে বিভিন্ন ছাঁচ বা পাটা চিহ্নিত মুদ্রা এত জনপ্রিয় হয়েছিল যে, পরবর্তী বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে এর প্রচলন অব্যাহত ছিল। অনেক অঞ্চলে এই জাতীয় মুদ্রা বোধ হয় বেসরকারিভাবে প্রচলিত ছিল। একসময় এগুলির প্রস্তুত প্রণালীর পরিবর্তন করে, একই ছাঁচে প্রয়োজনীয় ছবিগুলি উৎকীর্ণ করে তার মধ্যে ধাতু ঢেলে, ছাঁচে ঢালা পদ্ধতিতে মুদ্রাগুলি তৈরি করার প্রথা চালু হয়। এই ধরনের মুদ্রার ছাঁচ মথুরা, ঝুসি, শিশুপালগড়, কোণ্ডাপুর প্রভৃতি স্থানে পাওয়া গেছে। মৌর্যোত্তর যুগে ছাঁচে ঢালা বিভিন্ন আকারের তামার মুদ্রার বহুল প্রচলন হয়। উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে দু' দিকে ছবি যুক্ত তামার মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। একদিকে হাতি ও অন্যদিকে 'দুটি ঢিবির ওপরে একটি ঢিবি ও তার ওপরে বাঁকা চাঁদের' ছবি সমেত ছাঁচে ঢালা তামার মুদ্রা যেমন পাওয়া গেছে, তেমনই দু' দিকে একাধিক ছবির উপস্থিতি লক্ষ করা যায় অনেক ছাঁচে ঢালা তামার মুদ্রায়। আলোচ্য চিত্রগুলির মধ্যে আছে হাতি, ধ্বজাসমেত যষ্টি, বেড়ার মধ্যে গাছ, মোটা ক্রুস, স্বস্তিক চিহ্ন, তিনটি ঢিবির ওপরে চাঁদ, ষাঁড়ের মাথার নকশা ইত্যাদি মুদ্রাগুলি সরকারি (এবং বেসরকারি) টাঁকশালে তৈরি হয়েছিল।

ছাঁচে ঢালা মুদ্রার কোনও-কোনও শ্রেণীতে কিন্তু আঞ্চলিক প্রবণতা দেখা যায়। যেমন অযোধ্যা অঞ্চলের লেখবিহীন মুদ্রার একদিকে বা দু' দিকে একটি করে দেখানো যেসব ছবি আছে সেগুলির মধ্যে কয়েকটি (যেমন একজাতীয় ফুল, একটি বিশেষ নকশা ইত্যাদি) কেবল ওই অঞ্চলেই অপেক্ষাকৃত বেশি পরিচিত ছিল বলে মনে হয়।

মৌর্যযুগের শেষের দিকে বা খুব সম্ভবত মৌর্যযুগের পরে (খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর শেষপাদে বা দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথমপাদে) এক বা একাধিক ছবির নঞর্থক রূপ উৎকীর্ণ একটি পাটা চিহ্নিত মুদ্রার প্রচলন হয় বেশ কয়েকটি অঞ্চলে। এই প্রথায় মুখ্য দিকের জন্য একটি এবং প্রয়োজন হলে গৌণ দিকের জন্য আরও একটি (ধাতবযোগ্য মুদ্রাখণ্ডের প্রায় সমান মাপের) ছাঁচ বা পাটা ব্যবহার করা হত। কোনওদিকে একের বেশি ছবি থাকলেও সবগুলির নঞর্থক রূপ একই পাটায় উৎকীর্ণ করা হত। এইভাবে তৈরি একটি পাটা বা ছাঁচ একদিকে বা এই ধরনের দুটি ছাঁচ ধাতবখণ্ডের দু' দিকে আঘাত করে তৈরি মুদ্রাকে ছাঁচ চিহ্নিত মুদ্রা বলে। এই পদ্ধতি আঙ্গিকের দিক থেকে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ছাঁচ চিহ্নিত মুদ্রা থেকে উৎপন্ন, কিন্তু আরও উন্নত শ্রেণীভুক্ত। এই প্রণালীতে অল্প গরম করা করা মুদ্রাযোগ্য ধাতবখণ্ডের ওপরে একটি ছাঁচ দিয়ে একদিকে আঘাত করার পরে প্রয়োজন হলে অন্য একটি ছাঁচ দিয়ে গৌণ দিকে আঘাত করা হত বলে মনে হয়। পরে দু' দিকে একইসঙ্গে আঘাত করার প্রথা প্রচলিত হয়েছিল।

দু' দিকে ছাঁচ চিহ্নিত তক্ষশিলা অঞ্চলের মুদ্রা

মৌর্যোত্তর যুগে ছাঁচে ঢালা বিভিন্ন আকারের তামার মুদ্রার বহুল প্রচলন হয়। উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে দু' দিকে ছবি যুক্ত তামার মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে।

ধাতবখণ্ডের প্রায় সম মাপের ছাঁচ চিহ্নিত মুদ্রা তৈরির সূত্রপাত প্রাক-মৌর্য যুগেই হয়ে থাকতে পারে এবং এর পেছনে কিছু বিদেশী প্রভাবও থাকতে পারে। কিন্তু এর বহুল প্রচলন শুরু হয় মৌর্যোত্তর যুগে। তক্ষশিলা, উজ্জয়িনী প্রভৃতি অঞ্চলে এই জাতীয় তামার মুদ্রা পাওয়া গেছে।

এই শ্রেণীর ছাঁচ বা পাটা চিহ্নিত কিছু মুদ্রায় লেখ দেখা যায়। প্রাচীন দেশীয় কর্তৃপক্ষের টাঁকশালে তৈরি মুদ্রায় সেই প্রথম লেখ-এর আবির্ভাব। এই প্রসঙ্গে আমরা এরানে প্রাপ্ত 'ধমপালস' লেখ উৎকীর্ণ মুদ্রা, 'উজে নিয়ি' নামে উৎকীর্ণ উজ্জয়িনীর মুদ্রা এবং তক্ষশিলা অঞ্চলের কিছু মুদ্রার উল্লেখ করতে পারি। তক্ষশিলার এক শ্রেণীর লেখসমেত ছাঁচে আহত মুদ্রা খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের প্রথমার্ধের গ্রিক রাজা আগাথোক্লিসের একপ্রকার মুদ্রাকে প্রভাবিত করেছিল। সুতরাং খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর গোড়ার দিকেই লেখসমেত ভারতীয় মুদ্রার প্রচলন হয়েছিল বলে মনে হয়।

প্রায় একই সময়ে ছাঁচে ঢালা মুদ্রাতেও লেখ-এর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। প্রসঙ্গত আমরা একদিকে সূর্য এবং অন্যদিকে বেড়ার মধ্যে গাছ ও 'কাড়স' লেখসমেত মুদ্রার উল্লেখ করতে পারি।

অশোকোত্তর যুগে (খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর শেষপাদ ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে) উত্তর ভারতে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের মুদ্রার প্রচলন হয়েছিল। এই মুদ্রা ব্যবস্থার ওপরে কোনও শক্তিশালী কেন্দ্রের একক নিয়ন্ত্রণ ছিল না। কিন্তু তাতে মুদ্রা ব্যবহারের কমতি খুব একটা হয়নি। উপরন্তু ওই যুগে দেশীয় মুদ্রা লেখবিহীন স্তর থেকে লেখযুক্তের স্তরে পৌঁছেছিল। অবশ্য ছাঁচে ঢালা লেখবিহীন মুদ্রা আরও কয়েক শতাব্দী বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। অন্যদিকে মৌর্যোত্তর যুগেই উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রচলিত হয়েছিল অভারতীয় রাজাদের নামাঙ্কিত উন্নত শ্রেণীর পাটায় অঙ্কিত মুদ্রা।

(ক্রমশ)

Amelia-4 (22.8.90)

টারজান

এডগার রাইস বারোজ

টারজান অস্ট্রেলিয়ার জনবিরল অঞ্চলে রায়ান ম্যাককালাঘের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছে...

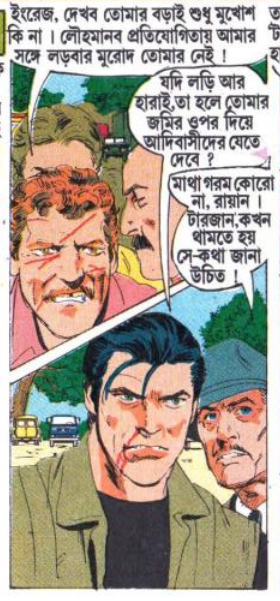

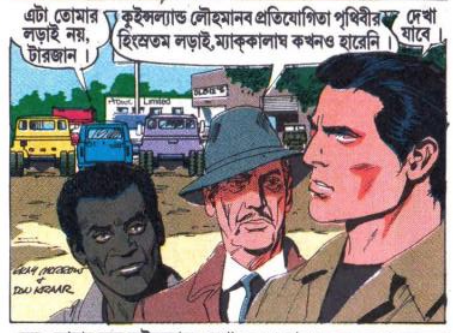

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

ধারাবাহিক উপন্যাস

কালাপাহাড়

সমরেশ মজুমদার

লাল রঙের নতুন মোটরবাইকটাকে ইতিমধ্যে জলপাইগুড়ি শহরের অনেকেই চিনে গিয়েছে। শহরের সবাই জানে রোজ সকাল আটটায় বাইকটা কদমতলা থেকে রূপসী সিনেমার সামনে দিয়ে থানাটাকে বাঁ দিকে রেখে ঐকটু এগিয়েই বাঁ দিকে করলার ধার ঘেঁষে হাকিমপাড়ার দিকে চলে যাবে। কেউ-কেউ তো ওই যাওয়া দেখেই বুঝে নেয় এখন আটটা বাজে। মোটরবাইকটা চালাতে খুব আরাম পায় অর্জুন।

বাইকটা উপহার দিয়েছেন নন্দিনীর বাবা দিল্লির মিস্টার রায়। সেই যে নন্দিনীরা চার বন্ধু মিলে নর্থবেঙ্গলে বেড়াতে এসে ঝামেলায় পড়েছিল, তা থেকে উদ্ধার করেছিল বলে তিনি ওই উপহারটি দিয়েছেন। অবশ্যই উপহারটি এসেছিল অমলদার মারফত।

প্রত্যেক সকালে লাল বাইক চালিয়ে অমল সোমের বাড়িতে যাওয়া অভ্যাস অর্জুনের। সেখানে গিয়ে বইপত্তর ঘাঁটে, হাবুর দেওয়া চা খায়। কখনও-সখনও মেজাজ ভাল থাকলে অমলদা গল্প করেন। সত্যসন্ধানের ব্যাপারে তিনি এখন খুব সক্রিয় ভূমিকা নেন না বটে, তবে থানার নতুন দারোগা শ্রীকান্ত বকসি সমস্যায় পড়লেই ওঁর কাছে ছোটেন।

আজ রূপশ্রী পেরিয়ে থানার সামনে আসতেই অর্জুন দেখল থানার গেটের সামনে শ্রীকান্ত বকসি এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছেন। পাশেই নীল রঙের অ্যাম্বাসাডার দাঁড়িয়ে আছে। ওকে দেখতে পেয়েই দারোগাবাবু হাত তুললেন, "তোমার জন্য দাঁড়িয়ে আছি হে।" অর্জুন গতি থামাল।

শ্রীকান্ত বকসি এগিয়ে এলেন, "আমাকে এখনই একটু বেলাকোবায় যেতে হবে। এর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ইনি হরিপদ সেন। আমার কাছে এসেছিলেন অমলবাবুর ঠিকানার জন্য। থাকেন দমদম এয়ারপোর্টের কাছে। এর নাম হল অর্জুন। আমাদের শহরের গৌরব ও। অনেক রহস্য উদ্ধার করেছে। অমলবাবুর শিষ্য।"

অর্জুন নমস্কার করতেই ভদ্রলোক প্রতিনমস্কার করলেন। অর্জুন বলল, "ওই গাড়িটা কি আপনার?"

ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, "না, শিলিগুড়ি থেকে ভাড়া করেছি।"

"ও। আপনি ড্রাইভারকে বলুন আমাকে ফলো করতে।"

করলা নদীর ধার দিয়ে যেতে-যেতে পেছনে তাকিয়ে সে দেখল, গাড়িটা ঠিকঠাক আসছে। একেবারে কলকাতা থেকে কোনও ক্লায়েন্ট অমলদার খোঁজে আসছে মানে কেউ ওঁকে আসতে বলেছেন। অমলদা নিজে সক্রিয় ভূমিকা নেন না যখন, তখন তাকেই কাজটা করতে হবে। কী ধরনের কাজ তা আন্দাজে না এলেও বেশ উত্তেজনা বোধ করছিল সে। কলকাতায় যেতে হবে নাকি এ-ব্যাপারে?

অমল সোমের বাড়ির গেটে বাইক থামিয়ে সে হাত তুলল। গেট খুলে বাইকটাকে ভেতরে ঢুকিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে দেখল ভদ্রলোক গাড়ি থেকে নেমে পড়েছেন। সে বলল, "এটাই অমলদার বাড়ি। আসুন আমার সঙ্গে।"

একটু এগোতেই হাবুকে দেখতে পাওয়া গেল বাগানে। মরা পাতা ছাঁটছে। ইশারায় অমলদাকে খবর দিতে বলতেই দাঁত বের করে দেখিয়ে হাবু ভেতরে চলে গেল। বসার ঘরের দরজা খোলা। বারান্দায় উঠে অর্জুন ভদ্রলোককে বলল, "আপনি ভেতরে বসুন।"

ভদ্রলোক বললেন, "বাঃ, বেশ বড়-বড় ফুল হয়েছে তো!"

অর্জুন হাসল, "এ-সবই হাবুর কৃতিত্ব। ওর জিভ কথা বলতে পারে না কিন্তু হাত কথা বলে।"

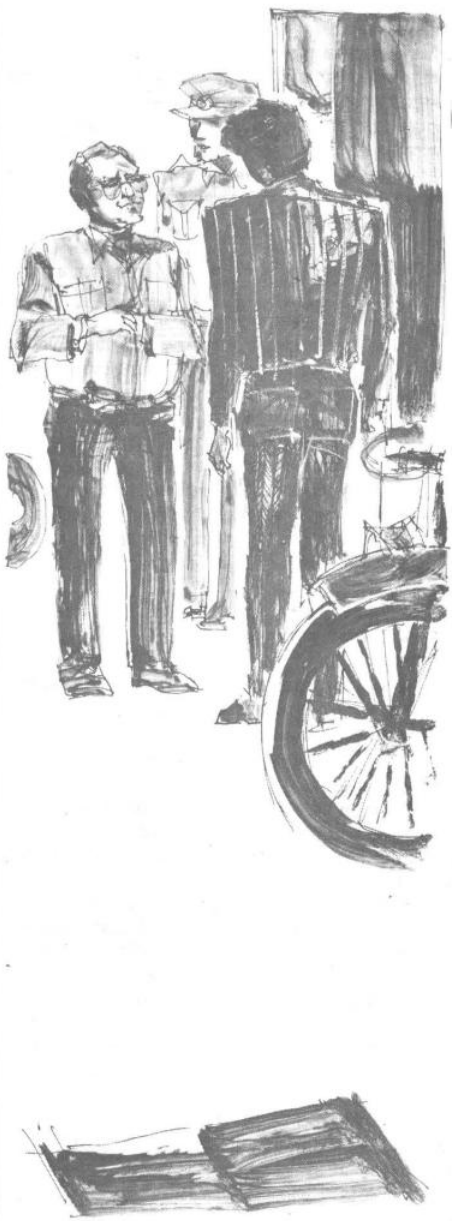

"হাত কথা বলে ?" হরিপদ সেন মাথা নাড়লেন, "চমৎকার বললেন ভাই।"

হরিপদ সেনের বয়স ষাটের ধারেই। একটু অস্বস্তি হলেও আপনি বলার জন্য এখনই আপত্তি করল না অর্জুন। কাজ করতে গিয়ে নানান মানুষের সংস্পর্শে এসে এটুকু পরিবর্তন হয়েছে। সে হরিপদ সেনের চেহারাটা দেখল। হাওয়াই শার্ট-প্যান্ট-চশমায় বেশ নাদুসনুদুস চেহারা। পায়ে বেশ দামি জুতো। শিলিগুড়ি থেকে ট্যাক্সি ভাড়া করে রেখেছেন, মানে পকেটে ভাল টাকা আছে। লোকটার আঙুলে কোনও আংটি নেই। চেয়ারে বসার পর বোঝা গেল ডান হাতের কড়ে আঙুল অনেকখানি বাঁকা। ইনি কী করেন তা সে আন্দাজ করতে পারল না।

"আপনি এদিকে এর আগে এসেছেন ?" অর্জুন সময় কাটানোর জন্য প্রশ্ন করল।

"অনেকবার।" ভদ্রলোক আর কথা বাড়ালেন না।

বিদ্যাসাগরী চটির আওয়াজ পাওয়া গেল। ইদানীং অমলদার খুব পছন্দ ওই চটি। ভেতরের দরজায় শব্দটা থামতেই অমলদাকে দেখা গেল। ঝুল ফতুয়া আর পাজামা পরা। দেখা হওয়ামাত্র বললেন, "ওহে অর্জুন, তোমার-আমার জন্য একটা ভাল খবর আছে।" তারপরেই হরিপদবাবুর ওপর নজর যাওয়ামাত্রই দুটো হাত জোড় করে বললেন, "নমস্কার। আমি অমল। আমার বাড়িতে আপনি এসেছেন, আগে আপনার সঙ্গেই কথা বলা উচিত ছিল। বসুন, বসুন।" বলতে-বলতে একটি চেয়ার টেনে নিলেন তিনি। হরিপদবাবু মৃদু হেসে বললেন, "আমি আপনার নাম শুনেছি প্রোফেসর বনবিহারী ভট্টাচার্যের কাছে। একটি অত্যন্ত জরুরি প্রয়োজনে সাহায্যের আশায় আপনার কাছে ছুটে এসেছি আমি।"

অর্জুন বলল, "থানার সামনে শ্রীকান্তবাবু ওঁকে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন।" অর্জুন আলাপ করিয়ে দিল।

"শ্রীকান্তকে আগেই চিনতেন ?" অমলদা জিজ্ঞেস করলেন।

"না, না। আপনি জলপাইগুড়িতে আছেন এইটুকুই জেনেছিলাম। ভাবলাম, থানায় গেলে নিশ্চয়ই আপনার ঠিকানাটা জানা যাবে।" হরিপদবাবু দুই হাঁটুর ওপর হাত রেখে সোজা হয়ে বসলেন।

"আপনার সমস্যাটা কী ?" খুবই অনাগ্রহ নিয়ে প্রশ্ন করলেন অমলদা।

"একটি মানুষের গতিবিধি বের করতে হবে আপনাকে।"

"ওঃ, সরি। এজন্য কলকাতা থেকে এতদূরে এলেন কেন ? কলকাতায় অনেক এজেন্সি আছে, যাদের বললে সাগ্রহে করে দেবে।" অমল সোম উঠে দাঁড়ালেন।

"আপনি একটু শুনুন মিস্টার সোম। আমি জানি প্রস্তাবটা খুবই হাস্যকর শোনাবে, কিন্তু উপায় নেই। সাধারণ ডিটেকটিভ এজেন্সির পক্ষে কাজটা করা সম্ভব নয়। প্রোফেসর বনবিহারী আমাকে বললেন আপনিই ঠিক মানুষ। আমি যাঁর গতিবিধি জানতে চাই তিনি এখনকার মানুষ নন। তিনি ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে মারা যান।"

"অদ্ভুত। ইন্টারেস্টিং।" অমল সোম বসে পড়লেন আবার, "এতদিন জীবিত মানুষ নিয়ে কাজ করেছি। মৃত মানুষ, তাও আবার চারশো দশ বছর আগে মৃত মানুষের কেস নিয়ে কেউ আসবেন ভাবতে পারিনি। মানুষটির নাম কি আমরা জানি ?"

"জানা স্বাভাবিক। অন্তত ইতিহাসের বইয়ে দু-চার লাইন প্রত্যেকেই একসময় পড়েছি। ওঁর নাম যাই হোক, ইতিহাস ওঁকে কালাপাহাড় নামে কুখ্যাত করেছে।"

"কালাপাহাড় !" অমলদাকে এমন বিস্মিত হতে অর্জুন কখনও

দেখেনি।

হরিপদ সেন কথা বলতে যাচ্ছিলেন, এই সময় হাবু এল চায়ের ট্রে নিয়ে। সেইসঙ্গে জলপাইগুড়ির সূর্য বেকারির তৈরি সুজির বিস্কুট। দামি কম্পানির বিস্কুটে আজকাল মন ভরছে না অমলদার। অর্জুন জানে এই বিস্কুট মাসখানেক এ-বাড়িতে চলবে। কিন্তু চায়ের পেয়ালা হাতে নিলেও সে হরিপদ সেনকে অবাক হয়ে দেখছিল। কালাপাহাড় লোকটি সম্পর্কে সে ইতিহাসে যা পড়েছে তাতে ভয়ই হয়। ওঁর নামকরণেই সেটা বোঝা যায়। এমন একটি মানুষের গতিবিধি জানতে চারশো বছর পর কেউ উৎসুক হবেন কেন ?

অমলদার জন্য চা আসেনি। তিনি এ-সময় চা খান না। বললেন, "মিস্টার সেন, আপনি কি কলেজে-টলেজে ইতিহাস নিয়ে পড়াচ্ছেন ?"

মাথা নাড়লেন ভদ্রলোক, "না, না। আমার একটা ছোটখাটো ব্যবসা আছে।" চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, "চমৎকার চা। দার্জিলিং-এর ?"

অমলদা হাসলেন, "না। ডুয়ার্স অসম দার্জিলিং মিলিয়ে একটা ককটেল।"

হরিপদবাবু নিবিষ্ট মনে কয়েক চুমুক দিয়ে বললেন, "কালাপাহাড় এ-অঞ্চলে দীর্ঘকাল ছিলেন। ইতিহাস বলছে লোকটি অত্যন্ত ভয়ানক। কিন্তু আমার কাছে প্রমাণ আছে তিনি খুবই নিঃসঙ্গ ছিলেন। এই উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়, তখন অবশ্য জেলা হিসেবে চিহ্নিত ছিল না, উনি ঘোরাফেরা করেছেন। কিন্তু কোথায়-কোথায় ছিলেন এই ডিটেলস পাওয়া যাচ্ছে না। আপনারা যদি সেটা বের করে দেন···।"

"কেন ?" আচমকা প্রশ্নটি বেরিয়ে এল অর্জুনের মুখ থেকে।

অমলদা মাথা নাড়লেন, "গুড। এই প্রশ্নটি আসা খুবই স্বাভাবিক। কেন আপনি এই ঐতিহাসিক চরিত্রটির সম্পর্কে এত আগ্রহী ? আপনি কি ইতিহাসের ছাত্র ?"

হরিপদ সেন একটু ইতস্তত করলেন, "আজ্ঞে না। আমি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলাম। আগ্রহী হওয়ার একটা কারণ ঘটেছে। আমার ঠাকুর্দার ভাই বিয়ে-থা করেননি। তিনি থাকতেন পুরীতে। একাই। প্রায় নব্বই বছর বয়স। আমার সঙ্গে চিঠিপত্রে যোগাযোগ ছিল। শেষবার পুরীতে গিয়েছিলেন বছর পনেরো আগে। হঠাৎ মাস তিনেক আগে তিনি লেখেন আমাকে সেখানে যেতে। বিশেষ দরকার। গিয়েছিলাম। দেখলাম উনি খুবই অশক্ত হয়ে পড়েছেন। মনে-মনে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছেন। উনি আমাকে কিছু কাগজপত্র দিলেন। এই কাগজগুলো প্রায় দুশো বছর আগে ওঁর প্রপিতামহ লিখেছিলেন। ইনি যক্ষের মতো সব আগলে রেখেছিলেন। আমায় বললেন, ইচ্ছে হলে হদিস করতে পারি।"

"কিসের হদিস ?"

"কাগজপত্র দেখলে আপনি বুঝবেন ব্যাপারটা। সংক্ষেপে যেটুকু জেনেছি, বলি। আমরা আসলে কনটিকের মানুষ। পালযুগে আমাদের কোনও পূর্বপুরুষ আরও অনেকের সঙ্গে গৌড়ভূমিতে আসেন। তাঁরা যুদ্ধ করতে জানতেন, ফলে পালরাজাদের সৈন্যবাহিনীতে কাজ করতে অসুবিধে হয়নি। আপনারা নিশ্চয়ই সামন্ত সেন, হেমন্ত সেন, বিজয় সেনের নাম শুনেছেন, যাঁরা সেনসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁদের উত্তরাধিকারী হলেন বল্লাল সেন, লক্ষ্মণ সেন। আমার পূর্বপুরুষরা এঁদের রাজত্বে ভাল মর্যাদায় ছিলেন। তারপর মুহম্মদ বকতিয়ার খিলজি এলেন, মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠা হলেও আমার পূর্বপুরুষরা রাজকর্মচারীর পদ হারালেন না। সুলেমান কিরানি এবং তাঁর ছেলে দাউদের সেনাপতি ছিলেন কালাপাহাড়। ইনি যখন পুরী আক্রমণ করেন তখন আমার এক পূর্বপুরুষ তাঁর অনুগামী হন। কিন্তু সেখানে কালাপাহাড়ের আচরণে সন্তুষ্ট না হয়ে সৈন্যবাহিনী ত্যাগ করে পুরীতেই থেকে যান। পরে আমার ঠাকুর্দা ফিরে এসেছিলেন বাংলাদেশে কিন্তু তাঁর ভাই থেকে গিয়ে ছিলেন। মোটামুটি এই হল বৃত্তান্ত।"

"খুবই ইন্টারেস্টিং। কিন্তু এত তথ্য কি ওই কাগজপত্রে পেয়েছেন আপনি ?"

"না। কালাপাহাড়ের সঙ্গে আমার যে পূর্বপুরুষ পুরীতে অভিযান করেছিলেন তাঁর নাম নন্দলাল সেন। তাঁর সম্পর্কে অনেক কথা লেখা আছে। পরে আমি কিছুটা ছোট ঠাকুর্দার কাছে, কিছুটা ইতিহাস বই ঘেঁটে, আবার প্রোফেসর ভট্টাচার্যের কাছে শুনে এইটে খাড়া করেছি।" হরিপদ সেন রুমালে মুখ মুছলেন। এই না-গরম আবহাওয়াতেও ওঁর ঘাম হচ্ছিল।

অমল সোম বললেন, "আপনার বংশের ইতিহাস শুনলাম। কিন্তু আপনি কেন কালাপাহাড় সম্পর্কে এতটা আগ্রহী তা বোধগম্য হচ্ছে না।"

ভদ্রলোক জবাব না দিয়ে উসখুস করতে লাগলেন।

অমল সোম বললেন, "দেখুন। আমি এখন সাধারণ কেস নিই না। ভাল লাগে না। যা করার অর্জুনই করে। কিন্তু এটিকে সাধারণ বলা যায় না। আপনাকে সাহায্য করতে পারি যদি আপনি কোনও কথা গোপন না করেন !"

"আমি জানি, জানি।" ভদ্রলোক রুমাল পকেটে ঢোকালেন, "আসলে এটা বলতে সঙ্কোচ হচ্ছে। প্রথমত, তথ্যটা ভুল হতে পারে। দ্বিতীয়ত, আর কেউ জানুক আমি চাইছি না। ভুল হলেও নয়। বুঝতে পারছেন ?"

অমলদা বললেন, "ডাক্তারকে কোনও রুগি রোগের কথা বললে তিনি তা পাঁচজনকে বলে বেড়ান না। আপনি যদি ভাবেন অর্ধেক জেনে কাজ করব তা হলে ভুল ভেবেছেন।"

হরিপদ সেন বললেন, "ইয়ে, ছোট ঠাকুর্দার প্রপিতামহ লিখেছেন, নন্দলাল সেন কালাপাহাড়ের সঙ্গে উত্তরবঙ্গ এবং অসমে অভিযান করেছিলেন। এই সময় অজস্র সোনা কালাপাহাড় মাটির তলায় গোপনে সরিয়ে রাখেন। তাঁর নবাবও এই খবর জানতেন না। নন্দলাল মনে করতেন সেই সোনার একটা অংশ তাঁর পাওনা। কালাপাহাড় তাঁকে সেটা দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। বোঝাই যাচ্ছে সেই সোনা উদ্ধার করা কালাপাহাড়ের পক্ষে আর সম্ভব হয়নি। নন্দলালের মুখ থেকে তাঁর পুত্র-পৌত্ররা যা শুনে এসেছে তা হল, কালাপাহাড় যেখানে সোনা রেখেছিলেন তার চারপাশে প্রায় দুর্ভেদ্য জঙ্গল, একটা বিশাল বিল আর শিবমন্দির ছিল। জায়গাটা উত্তরবঙ্গ অথবা অসমে। অসমে হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম, কারণ তখন তারা পুরীর দিকে যাত্রা করেছিলেন। মিস্টার সোম, আমি নন্দলাল সেনের উত্তরাধিকারী। ওই সোনার একটা অংশের ওপর আমার অধিকার আছে। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন ?"

"পারছি। কিন্তু আপনি আমাকে অনুরোধ করেছেন কালাপাহাড়ের এ অঞ্চলের গতিবিধির খবর জোগাড় করে দিতে। সোনা খুঁজে দিতে নয়।"

"না, না। এটা আমি আপনাকে বলতাম।" তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন হরিপদ সেন।

অমল সোম হাসলেন, "আপনি বুনো হাঁসের খোঁজে আমাকে ছুটতে বলছেন ?"

"হ্যাঁ, ব্যাপারটা সেইরকমই। আবার তাও নয়।"

"নয় মানে ?"

"আমার বিশ্বাস হচ্ছে এর পেছনে সত্যতা আছে।"

"কীরকম ?"

হরিপদ সেন পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করলেন। সেটা এগিয়ে দিলেন অমল সোমের দিকে। অমল সোম

কাগজটি খুলে চোখ রাখলেন। তাঁর ঠোঁটের কোণে কৌতুক ফুটে উঠল, "এটি কবে পেয়েছেন ?"

"গত সপ্তাহে। তারপরেই প্রোফেসর আমাকে বললেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে।"

"আপনার এই তথ্য আর কে কে জানেন ?"

"কেউ না। আমার ছোট ঠাকুর্দা আর আমি। পূর্বপুরুষরা যাঁরা জানতেন, তাঁরা অনেককাল আগে দেহ রেখেছেন।"

"আপনার বাবা জানতেন না ?"

"না। জানলেও আমাকে বলেননি। তা ছাড়া আমার ঠাকুর্দা অল্পবয়সেই চাকরি নিয়ে বাংলাদেশে চলে এসেছিলেন বলে বাবার পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না।"

"কিন্তু কেউ একজন জানেন, এটি তার প্রমাণ।"

"হ্যাঁ।"

"আপনার ঠাকুর্দা, আই মিন ছোট ঠাকুর্দা এখন কেমন আছেন ?"

হরিপদ সেন মাথা নাড়লেন, "আমি চলে আসার দিন দশেক বাদে সমুদ্রে স্নান করতে গিয়ে উনি মারা গিয়েছেন।"

"স্নান করতে গিয়ে মারা গেছেন ? উনি সমুদ্রস্নান করতেন ওই বয়সে ?"

"না। ভাল করে হাঁটতেও পারতেন না। আমি যখন গিয়েছিলাম তখন উনি নিষেধ করেছিলেন সমুদ্রে স্নান করতে। বলেছিলেন জলে খুব ভয় ওঁর। চৈতন্যদেবের উচিত হয়নি জলের কাছে যাওয়া।"

"চৈতন্যদেব ?"

"ঠাকুর্দা চৈতন্যদেবের ভক্ত ছিলেন।"

"ওঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে যাননি কেন ?"

"আমি পুরী থেকে ফিরেই চণ্ডীগড় গিয়েছিলাম ব্যবসার কাজে। বাড়ির লোক ঠিকানা জানত না। ফিরেছিলাম দিন কুড়ি বাদে। তখন গিয়ে কোনও লাভ হত না।"

"আপনাদের পুরীর বাড়ির কী অবস্থা ? নিজস্ব বাড়ি নিশ্চয়ই !"

"তালাবন্ধ আছে। যে ঠাকুর্দাকে দেখাশোনা করত সে জানিয়েছে।"

"এই চিঠি পোস্টে এসেছে ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। মিস্টার সোম, আপনি একটু সাহায্য করুন। যদিও চারশো বছরের বেশি সময় চলে গিয়েছে, কিন্তু সোনায় তো জং পড়ে না।"

"আপনার ব্যবসার অবস্থা কেমন মিস্টার সেন ?"

"খুব ভাল নয়।"

"আপনি আজকের রাতটা এখানকার হোটেলে থাকুন। থানার কাছে 'রুবি বোর্ডিং' নামে একটা সাধারণ হোটেল পাবেন। কাল সকালে আসুন। আমি ভেবে দেখি।"

হরিপদ সেনের মুখে হাসি ফুটল, "আমার সঙ্গে গাড়ি আছে। শিলিগুড়ির 'দিল্লি হোটেল' আমার পরিচিত। ওখান থেকে আসতে ঘণ্টাখানেকও লাগবে না। জিনিসপত্র সেখানেই রেখে এসেছি। কাল তা হলে আসব ?"

"বেশ। আপনার গাড়িতে যে কাগজপত্র আছে দিয়ে যান।"

"নিশ্চয়ই। আপনাকে দক্ষিণা বাবদ কত দিতে হবে এখন ?"

"দক্ষিণা পরে। আপাতত খরচ বাবদ হাজার তিনেক দেবেন। যদি কেস হাতে না নিই তা হলে আগামীকাল টাকা ফেরত পাবেন।"

হরিপদ সেন তৈরি হয়েই এসেছিলেন। পকেট থেকে একটা মোটা বাণ্ডিল বের করে গুনে-গুনে তিন হাজার টেবিলে রাখলেন। রেখে বললেন, "কেসটা রিফিউজ করবেন না মিস্টার সোম। প্লিজ।"

অমলদা কোনও কথা না বলে অর্জুনকে ইঙ্গিত করলেন হরিপদ সেনের সঙ্গে যেতে। বাগান পেরিয়ে গাড়ির পেছনের সিটের নীচে ফেলে রাখা একটা কাপড়ের ব্যাগ থেকে মোটা চওড়া খাম বের করে ভদ্রলোক অর্জুনের হাতে দিলেন।

অর্জুন বললেন, "এগুলো এভাবে ফেলে রেখেছেন ?"

ড্রাইভারের কান বাঁচিয়ে হরিপদ জবাব দিলেন, "বাজারের ব্যাগে রেখেছি বলে কেউ সন্দেহ করবে না। আচ্ছা, আসি।"

গাড়িটা বেরিয়ে গেলে অর্জুন ভেতরে এসে অমল সোমের হাতে প্যাকেটটা দিল। তিনি সেটা নিয়ে বললেন, "বেশিরভাগ অপরাধের পেছনে কাজ করে মানুষের লোভ। ও হ্যাঁ, বিষ্টুসাহেব এখানে আসছেন। তখন খবরটা বলা হয়নি। কাল চিঠি পেয়েছি।"

"বিষ্টুসাহেব ?" চিৎকার করে উঠল অর্জুন। আনন্দে। কালিম্পং-এর বিষ্টুসাহেব। এখন আমেরিকায় আছেন। চিকিৎসার জন্য গিয়েছিলেন। সে কিছু বলার আগেই অমলদা ভাঁজ করা কাগজটা এগিয়ে দিলেন, "এটা পড়ো আগে।"

কাগজটা খুলল অর্জুন। সুন্দর হাতের লেখা :

"হরিপদ সেন। যা করছ তাই করে খাও। নন্দলালের সম্পত্তির দিকে হাত বাড়ালে হাত খসে যাবে। কালাপাহাড়।"

(ক্রমশ)

ছবি : সুব্রত চৌধুরী

বিজ্ঞান : যেখানে যা হচ্ছে

গৌতম চক্রবর্তী

জাগুয়ার নিয়ে গবেষণা

ব্রাজিলের পান্তানাল অঞ্চলকে বলা হয় 'দক্ষিণ আমেরিকার সেরেঙ্গেটি'।
ব্রাজিল সরকারের সহায়তায় সম্প্রতি এই পান্তানাল অরণ্যে দুর্ধর্ষ এক গবেষণা চালিয়েছেন নিউ ইয়র্ক জুলজিকাল সোসাইটি ও ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটি।
দক্ষিণ আমেরিকার ট্রপিকাল রেইন ফরেস্ট বা ক্রান্তীয় বর্ষণবন ছাড়া আর কোথাও জাগুয়ারের স্বাভাবিক বসতি নেই। পান্তানাল অরণ্যে গত পঞ্চাশ বছরে এক হাজার জাগুয়ার মারা গেছে।
ঘন, গভীর অরণ্যের তুলনায় নদীর কাছাকাছি, জলাভূমির স্যাঁতসেঁতে অরণ্য তারা বেশি পছন্দ করে!
ব্রাজিলের সব র‍্যাঞ্চ-মালিককে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাঁরা যেন নদীর ধারের অরণ্যে গবাদি পশুদের চরাতে না নিয়ে যান।

ব্যাকটিরিয়াফোন

সোনি কম্পানির নতুন এম·ডি·আর·আর-টেন হেডফোন কানে লাগালেই এক অদ্ভুত আনন্দের স্বাদ পাওয়া যায়।
হেডফোনের প্রধান অংশ হল তার ডায়াফ্রাম।
প্রায় সব ডায়াফ্রামেই একরকম বিশেষ সঙ্কুচিত কাগজ ব্যবহৃত হয়। সোনির এঞ্জিনিয়াররা কিন্তু এই বিশেষ ডায়াফ্রাম তৈরি করেছেন একেবারেই অন্যরকম একটি পদার্থ দিয়ে।
অ্যাসিটোব্যাকটর অ্যাসি নামে বিশেষ ধরনের ব্যাকটিরিয়াকে শর্করা-দ্রবণে রাখলে দেখা যায় তারা একরকম পাতলা সেলুলোজ তৈরি করেছে। এই সেলুলোজ দিয়েই তৈরি হয়েছে এই হেডফোনের ডায়াফ্রাম।
এই ডায়াফ্রামটি আবার বসানো হয়েছে ২০০ বছরের পুরনো জেলকোভা কাঠের ওপর। এই জেলকোভা গাছ জাপানে দুটি নির্দিষ্ট অঞ্চল ছাড়া আর কোথাও জন্মায় না।
হেডফোনের আবরণটি তৈরি করা হয়েছে ভেড়ার চামড়া দিয়ে। তবে এর দাম শুনলে অনেকের চোখ কপালে উঠবে। মাত্র চার হাজার ডলার!

সুচবিহীন ইঞ্জেকশন

ফিলাডেলফিয়া মেডিক্যাল কলেজের ডঃ বেঞ্জামিন রুবেন্স অদ্ভুত একটি ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ আবিষ্কার করেছেন। এই সিরিঞ্জে কোনও সুচ নেই। সুচ ফোটানোর যন্ত্রণা রোগীদের আর সহ্য করতে হবে না।
রুবেন্সকে এককথায় বলা যেতে পারে ইঞ্জেকশন বিশারদ ডাক্তার, কয়েক বছর আগে বসন্তের টিকা দেওয়ার জন্য তিনি 'ডাবল নিডলড ইঞ্জেকশন' আবিষ্কার করেছিলেন। সেখানে একই সিরিঞ্জে দুটো সুচ বসানো ছিল। রুবেন্সের এই নতুন আবিষ্কারে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন খুব উৎসাহী।
ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জগুলিকে নাকি ঠিকমতো জীবাণুমুক্ত করা হয় না, এর ফলে বিভিন্ন সংক্রামক রোগ এক ব্যক্তির দেহ থেকে অন্য ব্যক্তিতে ছড়িয়ে পড়ে।
রোগ-সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে আজকাল বাজারে ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ বের হয়েছে, কিন্তু তাতেও তো সুচ ফোটানোর ব্যথা লাগে!
রুবেন্স তাঁর এই নতুন ইঞ্জেকশন-ব্যবস্থার নাম দিয়েছেন জেট-ইঞ্জেকশন।
জেট-প্রপালশনের মতো প্রচণ্ড গতিতে সিরিঞ্জ থেকে ওষুধ বের হয়ে কোষের ভেতরে পৌঁছে যাবে। হাইড্রলিক সিস্টেম নয়, নতুন এক সিস্টেমে এই ইঞ্জেকশন কাজ করবে।

চাবি টিপলে কম্পিউটারের পরদায় ভেসে উঠবে বিভিন্ন প্রতিশব্দ···

লেখকের জন্য কম্পিউটার

স্কুলের ছাত্র থেকে শুরু করে কবি, লেখক, নাটাকার, ঔপন্যাসিক সবাই এবার মার্শ ফিশারের নতুন কম্পিউটারের দৌলতে খুশি হয়ে উঠবেন!
উনিশশো সাতাত্তর সাল মাইক্রোচিপে প্রোগ্রামিং করা বুদ্ধি!
বিভিন্নভাবে ফিশারকে সাহায্য করেছেন ২৫০জন লোক, এতদিনে খরচ হয়েছে সর্বসাকুল্যে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ ডলার। মার্শ ফিশারের পাগলামি আজ সফল! এতদিনে তৈরি হয়েছে এক নতুন কম্পিউটার, তার নাম 'আইডিয়া ফিশার'।

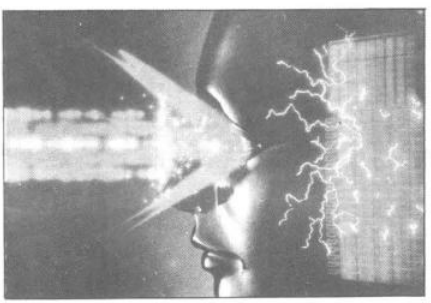

থেকে মার্শ ফিশার একটি বিষয় নিয়ে তীব্রভাবে মেতে উঠেছিলেন। কম্পিউটারের আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স!
কীভাবে সফল হল এই কাজ? কিছুই না, স্রেফ পারমুটেশন আর কম্বিনেশনের অঙ্ক! মানুষের মস্তিষ্ক সংযোগ-প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন তথ্য মনে রাখে।
ফিশারের এই কম্পিউটারে 'র'-এর সঙ্গে রেস্তরাঁর প্রোগ্রামিং করা আছে। ধরা যাক, 'রেড' শব্দের সঙ্গে কী যোগ করা যেতে পারে? চাবি টিপলে কম্পিউটারের পরদায় ভেসে উঠবে 'রেড টেপ', 'রেড স্কোয়ার', 'বুলফাইট' ইত্যাদি প্রায় ৬০০ শব্দ।
ফিশারের কম্পিউটারে এরকম ৬৫,০০০ শব্দ আছে। তাদের ২৮টি বিভাগে ভাগ করে ৬৭ লক্ষ ৫ হাজার উপায়ে যোগ করা আছে।
তাই, মনোমতো শব্দ খুঁজে পেতে লেখকদের আর কলম কামড়ে ভাবতে হবে না। পরীক্ষার খাতায় ভালভাবে রচনা লেখা, প্রতিশব্দ গঠন করা? আইডিয়া ফিশার এখন থেকে সমস্ত সমস্যার সমাধান করে দেবে।

এখন শুধু বাছাইকরা বাজারেই পাওয়া যায়।

GL/L/1/90 BEN

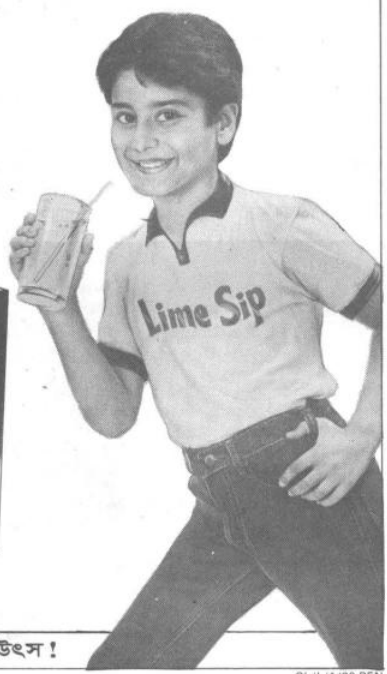

কয়েকজন সেরা খেলোয়াড় জখম হওয়ায় রয় দলে কিছু পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছে— রোভার্সের প্রবীণ গোলরক্ষক টাবি মর্টনকে ফিরিয়ে এনেছে। কিন্তু রয় ষ্ট্রীর সঙ্গে ঝগড়ার ফলে মাঠে ফাউল করায় টাইনকাস্টার পেনাল্টিতে গোল করে এগিয়ে গেছে···
স্টিভ, যে-লোকটা গোল দিল, তোমার উচিত ছিল তাকে আড়াল করে রাখা !
আমি তো রয়ের দেওয়ালে দাঁড়াবার অপেক্ষায় ছিলাম !
দোষটা রয়ের ! ঝালটা তার ওপরই ঝাড়ো !

রোভার্সের রয়

আশ্চর্য ! খেলা শুরু হয়েছে মাত্র পাঁচ মিনিট ! আর রোভার্স রাস্তার বেড়ালের মতো ঝগড়া শুরু করেছে !
আর দোষটা প্রায় সবই রয়ের ঘাড়ে পড়ছে !
টাবি মর্টনই সামাল দিল ···
রয়ের ওপর একটু বেশি কড়া হচ্ছ !
মানে··· ?
আমরা বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছিলাম আর তার সুযোগ নিয়েছে টাইনকাস্টার ! নিজেদের মধ্যে ঝগড়া না করে আমাদের উচিত খেলায় ফিরে যাওয়া !
টাবি ঠিক বলেছে ! চলো, আগে গোল শোধ করি, তদন্ত পরে করলেও হবে !
সেটাই ঠিক, গ্লেন রিচি ···
কিন্তু ফের যখন খেলা শুরু হল···
তুষারপাত শুরু হয়েছে ! ঘন হয়ে পড়ছে !
এর ফলে এমন কিছু সমস্যা হবে রয় যা আশা করেনি !
ঠিক তাই, মাঠ যখন বিপজ্জনক হয়ে উঠল···
স্টিভ নেলোর পিছলে পড়েছে ! বিপক্ষের রাইট উইঙ্গার ঢুকে পড়েছে !
উহহহ !

টাবি কোনওমতে হাত দিয়ে বল ঠেলে দিল···
ঢুকে পড়ো, টাইনকাস্টার !
রেসি আগে পৌঁছে গেছে ! চমৎকার সামলেছে, রয় !
কিন্তু গোল প্রায় হয়ে গিয়েছিল ! মেলচেস্টার রক্ষণভাগ দারুণ চাপে পড়েছে !
বিরতির সময়···
এক বুড়ো গোলে থাকলে আর কী আশা করা যায় ?
হ্যাঁ ! আমার মতে টাবি মর্টনকে এবার বাতিল করা উচিত !
টাবিকে নিয়ে রয়েরও চিন্তা হচ্ছিল···
খেলা শুরু হলে তুষার তোমার চোখে এসে পড়বে, টাবি !
ভেবো না, রয়, আমি জাদু-টুপি সঙ্গে এনেছি···
··· আর আমার পুরনো দস্তানা । যত তুষারই পড়ুক, পরলে বল হাত থেকে ফসকাবে না !
খেলা আবার শুরু হলে···
আরে ! বুড়ো টাবির দিকে তাকাও !
একটা পাইপ আর একটা চাদর হলেই ও তুষার-মানব হয়ে যাবে !
অনুকূল হাওয়ায় টাইনকাস্টার হামলা শুরু করল···
দূর থেকে একটা বল সোজা গোলের মুখে এল !
মর্টন মরেছে !
আমার বল !
না ! দারুণ ধরেছে ! বল থেকে ও চোখ সরায়নি !
টাবি নিজেকে এবং বলকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনলেও···
টাবি পড়ে গেছে, বল ছুটে গেছে !
হারুক বা জিতুক রোভার্সে নিশ্চয় এটা ওর শেষ খেলা !
আহহহ্ !
টাইনকাস্টার কি আরও গোল দেবে ? উত্তরটা পরের সংখ্যায় জানা যাবে !
(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

আনন্দমেলা
রবার্তো দোনাদোনি

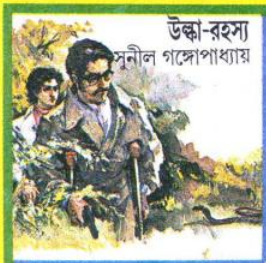
উল্কা-রহস্য
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

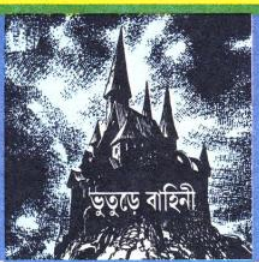
ভুতুড়ে বাহিনী

চক্রপুরের চক্করে
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

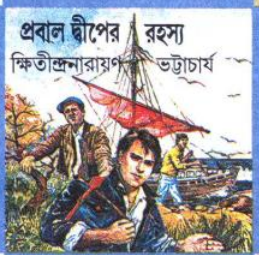
প্রবাল দ্বীপের রহস্য
ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

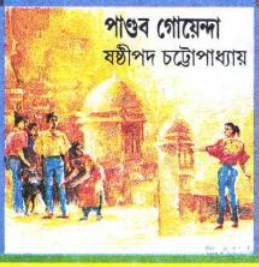
পাণ্ডব গোয়েন্দা
ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

দাম ৪৮ টাকা

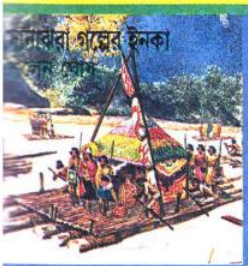

রহস্য, রোমাঞ্চ, অ্যাডভেঞ্চার, বিজ্ঞান, খেলা, কল্পকাহিনী··· সেরা লেখার যোগফল··· আনন্দমেলা

স্বর্ণপর্ণী । গাছ নয়, গাছড়া । এতে আছে দারুণ শক্তিশালী ওষুধের উপাদান, রসায়ন-শাস্ত্রেও যার উল্লেখ নেই । অনেক খুঁজে তরুণ প্রোফেসর শঙ্কু এই গাছড়া আনলেন তাঁর বাগানে । তারপরই চাঞ্চল্যকর সব ঘটনার শুরু । এই উত্তেজনা ফুরনোর আগেই চলে যাও আসামের হাফলঙ, গোপালপুর-অন-সি-র বদলে যেখানে ভুলিয়ে নিয়ে যাওয়া হল সন্তু ও কাকাবাবুকে । ক্রাচ কেড়ে তাঁকে ঠেলে দেওয়া হল অতল খাদে । কী হল তারপর ? গোপালপুরে উল্কাপাতের রহস্যই বা কী ? একনিশ্বাসে পড়েই যোগ দাও মধ্যপ্রদেশে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের চাঞ্চল্যকর সব অভিজ্ঞতা । গায়ে কাঁটা দেয়···আরও মজার অজস্র উপকরণের যোগফল ! কবিতা, ধাঁধা, খেলা, সাত-সাতটি উপন্যাস, গল্পের এক মস্ত যোগফল এবার পুজোয় তোমাদের মনের মতো পূজাবার্ষিকী আনন্দমেলা ।

তোমাদের মনের মতো রঙিন পূজাবার্ষিকী

আনন্দমেলা

১৩৯৭

খেলাধুলো

4 তদিনে গুচ পেলেন প্রাপ্য সম্মান

ভাল-ভাল অনেক ইনিংস খেলেছেন গুচ । কিন্তু লর্ডসে ৩৩৩ রানের ইনিংসটি তাঁকে ক্রিকেটের মহানায়কদের মধ্যে জায়গা করে দিল । লিখেছেন বিকাশ চক্রবর্তী

"কব্জি ঘোরাও ! মারো জোরে..." উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠেছেন বিল মরিস । ইলফোর্ড ক্রিকেট-স্কুলের কোচ বিল মরিস ।

উইকেটের সামনে দাঁড়িয়ে ব্যাটিং প্র্যাকটিস করছে চোদ্দ বছরের একটি ছেলে । দীর্ঘক্ষণ কঠোর পরিশ্রমের ফলে তার হাত অবশ হয়ে আসছে, মুখ থেকে টপ টপ করে ঘাম ঝরে পড়ছে ।

চোদ্দ বছরের এই ছেলেটির নাম গ্রাহাম গুচ । বড় হয়ে সে ক্রিকেটার হতে চায় । ক্রিকেটের প্রতি তার আগ্রহ দেখে গ্রাহামের বাবা আলফ্রেড গুচ তাকে এই স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছেন ।

চোদ্দ বছর বয়স থেকে উনিশ বছর...এই পাঁচ-পাঁচটা বছর গ্রাহাম গুচকে কাটাতে হয়েছে বিল মরিসের তীব্র শাসনে । ক্রিকেট, ক্রিকেট আর ক্রিকেট ! ক্রিকেট ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছুই ভাবতে পারেন না বিল মরিস ।

বাবা আলফ্রেড ছোটবেলায় ছেলেটিকে মাঠে নিয়ে গিয়ে ব্যাট ধরে প্র্যাকটিস করাতেন । বাবার কাছে প্রাথমিক তালিমটুকু নেওয়ার পর এখন পর্যন্ত এই বিল মরিসই গ্রাহামের জীবনে এক এবং একমাত্র কোচ । বিল মরিস ছাড়া গ্রাহাম গুচ আর কারও কাছে কখনও কোচিং নেননি ।

"থ্যাঙ্ক ইউ সার !" উনিশ বছরের ছেলেটি করমর্দনের জন্য একদিন আচমকা হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল গুরু বিল মরিসের দিকে । বলেছিল, "আই হ্যাভ বিন সিলেক্টেড !" এসেক্সের কাউন্টি ক্লাবে খেলার জন্য সে চুক্তি সই করেছে ।

"থ্যাঙ্ক ইউ ইয়ং ম্যান !" এসেক্সের আকাশে এখন খর দুপুরের তীব্র রোদ । মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে যেতে-যেতে বিল হাত রেখেছিলেন তাঁর এই প্রিয় ছাত্রের কাঁধে । বলেছিলেন, "একদিন তোমাকে যেতে হবে আরও অনেক দূরে । পৌঁছতে হবে নিজের লক্ষ্যে । সেই শুভদিনের জন্য আমি অপেক্ষা করছি ।"

সাঁইত্রিশ বছর বয়সে পৌঁছে চোদ্দ বছরের সেই দিনগুলোর কথা কখনও কি মনে পড়ে গ্রাহাম গুচের ? গুচের বয়স এখন সাঁইত্রিশ ।

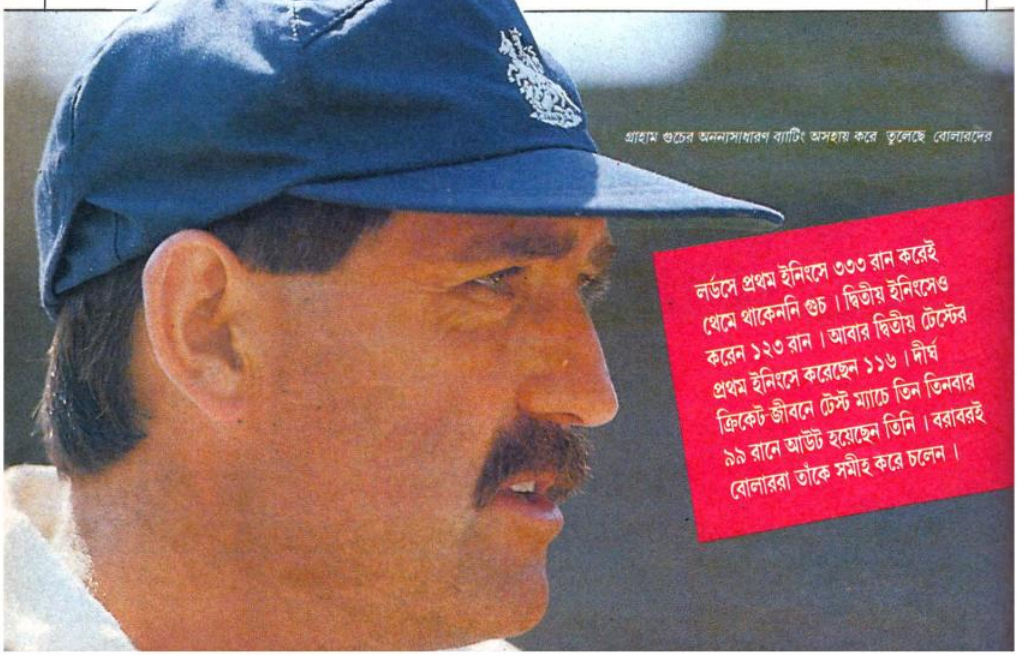

গ্রাহাম গুচের অনন্যসাধারণ ব্যাটিং অসহায় করে তুলেছে বোলারদের

লর্ডসে প্রথম ইনিংসে ৩৩৩ রান করেই থেমে থাকেননি গুচ । দ্বিতীয় ইনিংসেও করেন ১২৩ রান । আবার দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে করেছেন ১১৬ । দীর্ঘ ক্রিকেট-জীবনে টেস্ট ম্যাচে তিন তিনবার ৯৯ রানে আউট হয়েছেন তিনি । বরাবরই বোলাররা তাঁকে সমীহ করে চলেন ।

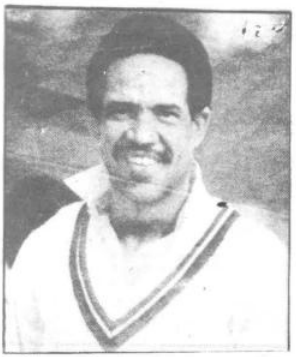

গারফিল্ড সোবার্স

লেন হাটন

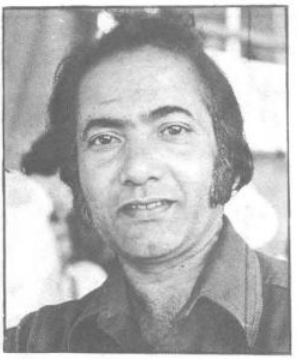

হানিফ মহম্মদ

ওয়াল্টার হ্যামন্ড

সোবার্স পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ১৯৫৭-'৫৮ সিরিজে কিংসটনে ৩৬৫ রানে নট আউট ছিলেন। টেস্টে ব্যক্তিগতভাবে এটাই সর্বোচ্চ রান। ইংল্যান্ডের লেন হাটন ১৯৩৮-এ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওভালে করেন ৩৬৪। পাকিস্তানের হানিফ মহম্মদ '৫৭-৫৮ সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে করেন ৩৩৭। হ্যামন্ড ৩৩৬ রানে নট আউট ছিলেন ১৯৩২-'৩৩-এ অকল্যান্ডে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্টে। ডন ব্রাডম্যান ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দু'বার ৩০০ রানের বেশি করেছেন। ১৯৩০-এ লিডসে ৩৩৪ এবং ১৯৩৪-এ ওই মাঠেই ৩০৪।

ডন ব্রাডম্যান

মধ্য বয়সের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে তিনি গড়লেন অসাধারণ এক রেকর্ড। ক্রিকেটের স্বর্গ লর্ডস-এর মাঠে তিনি ছাপিয়ে গেলেন ডন ব্র্যাডম্যানকে। লর্ডসে যে ক'টি টেস্ট ম্যাচ খেলা হয়েছে, তাতে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রান সংগ্রহের মুকুটটি ছিল সার ডন ব্র্যাডম্যানের। ১৯৩০ সালে ব্র্যাডম্যান ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২৫৪ রান করেছিলেন। লর্ডসে এর চেয়ে বেশি রান আর কেউ তুলতে পারেননি। লর্ডসের সবুজ ঘাসে কোনও ব্যাটসম্যানের হাত থেকে কখনও বেরোয়নি ত্রিশত রানের ফোয়ারা। ব্র্যাডম্যান ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধেই তাঁর জীবনের দুটি 'ট্রিপল সেঞ্চুরি' করেছিলেন, দুটিই লিডস-এর মাঠে। লেন হাটন ৩০০-র বেশি রান করেছিলেন ওভার মাঠে। কিংস্টন, ম্যানচেস্টার, মেলবোর্ন, ব্রিজটাউন, এইসব মাঠেও ট্রিপল সেঞ্চুরি করেছেন সোবার্স, সিম্পসন, কাউপার, রো-র মতো খেলোয়াড়। কিন্তু লর্ডস ? এতদিন পর্যন্ত তার ছিল না কোনও ত্রিশত রান সংগ্রহকারী নায়ক !

লর্ডস মাঠে প্রথম ত্রিশত রান এল এই গুচের ব্যাট থেকে। ২৭ জুলাই, ১৯৯০, ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট ম্যাচে। শুধু কি তাই ? ওই লর্ডস মাঠে গুচ সেদিন স্পর্শ করলেন আরও একটি রেকর্ড ! এখন পর্যন্ত মাত্র একজন খেলোয়াড় শুধুমাত্র লর্ডসেই ২০০০ রান তুলেছেন। তিনি গ্রাহাম গুচ। লর্ডস যদি হয় ক্রিকেটের স্বর্গ, সেই স্বর্গের নায়ক তা হলে একজনই। তিনি গ্রাহাম গুচ। তিনি যে একজন বড় ব্যাটসম্যান, সে স্বীকৃতি তিনি আগেই পেয়েছেন। কিন্তু লর্ডসের ৩৩৩ রানের ইনিংস তাঁকে ক্রিকেটের মহানায়কদের মধ্যে জায়গা করে দিল। দেরিতে হলেও তবু তো এই সম্মান পেলেন গুচ। এই সম্মান সত্যিই তাঁর প্রাপ্য ছিল।

টসে জিতেও সেদিন ব্যাটিং-এর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ভারতের অধিনায়ক আজহারউদ্দিন। ইংল্যান্ড দলের পক্ষে ওপেন করতে নামলেন গুচ ও আথারটন। ১৪ রানের মাথায় কপিলের বলে বোল্ড হয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরে গেলেন আথারটন। তাঁর ব্যক্তিগত রান সংগ্রহ তখন ৮। মাঠে নামলেন গাওয়ার। ৩৬ রান করার পর গুচের ব্যাট থেকে বেরিয়ে এসেছিল সহজতম একটি ক্যাচ, সেটি লুফতে পারলেন না উইকেটকিপার কিরণ মোরে। শেষ অবধি প্রভাকরের বলে আউট হয়ে যখন তিনি মাঠ ছাড়লেন, লর্ডসে তখন পরের দিনের বিকেল। আলো কমে এসেছে, মাঠে ছায়া

এ· স্যান্ডহাম

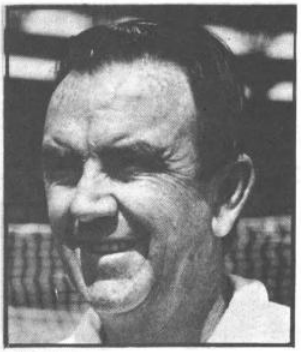

ববি সিম্পসন

এডরিচ

বব কাউপার

ইংল্যান্ডের স্যান্ডহাম ৩২৫ রান করেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে, ১৯২৯-৩০-এ কিংসটনে। অস্ট্রেলিয়ার ববি সিম্পসন '৬৪ সালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাঞ্চেস্টারে করেন ৩১১ রান। ইংল্যান্ডের জন এডরিচ লিডসে ১৯৬৫ সালে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ৩১০ রানে অপরাজিত ছিলেন। অস্ট্রেলিয়ার কাউপার মেলবোর্নে '৬৫-'৬৬ সালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে করেন ৩০৭। ওয়েস্ট ইন্ডিজের লরেন্স রো ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ব্রিজটাউনে করেন ৩০২। '৭৩-'৭৪ সিরিজে।

লরেন্স রো

ক্রমশ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে উঠছে। সমবেত করতালির মধ্যে দিয়ে, ব্যাট হাতে ফিরে যাচ্ছেন গ্রাহাম গুচ। নিঃসঙ্গ গোধূলিতে ক্লান্ত, বিষণ্ণ এক নায়ক।

গুচ অনেকদিন ধরেই বিষণ্ণ এক নায়ক। কারি কাপ খেলার জন্য ১৯৮৮ সালে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার ওয়েস্টার্ন প্রভিন্সের সঙ্গে। গুচ একা নন, গাওয়ার, বয়কট প্রমুখ আরও ছ'জন ইংরেজ ক্রিকেটার সেবার দক্ষিণ আফ্রিকায় খেলতে গিয়েছিলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে আসার পর গুচ সেবার ইংল্যান্ড দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হন। সেটা ১৯৮৮ সাল। ভারত ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে যাবে ইংল্যান্ড ক্রিকেট দল। প্রতিবাদে তুমুল ঝড় উঠল 'সাউথ আফ্রিকান নন-রেসিয়াল ওলিম্পিক কমিটি'র পক্ষ থেকে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের অ্যান্টিগুয়া, বার্বাডোজের মতো ছোট-ছোট রাজ্য জানাল, বর্ণবিদ্বেষী গুচকে তারা খেলতে দেবে না। ভারতও বাতিল করল টেস্ট-সিরিজ।

নিঃসঙ্গ গুচ। তাঁর বক্তব্য, "ক্রিকেটই আমার জীবিকা। অনবরত টেস্ট ম্যাচ খেলে আমি ক্লান্ত। তাই দক্ষিণ আফ্রিকায় খেলতে গিয়েছিলাম।"

গুচের বক্তব্য মানতে তখন রাজি নন ইংল্যান্ডের প্রধান নির্বাচক পিটার মে। ১৯৮২-তে দক্ষিণ আফ্রিকায় খেলতে গিয়েছিলেন গুচ, শাস্তিস্বরূপ পিটার মে তিন বছরের জন্য নির্বাসন দিলেন গুচকে। পিটার মে'র পর প্রধান নির্বাচক পদে এলেন টেড ডেক্সটার। তিনিও গুচকে খেলাতে রাজি নন।

১৯৮৫ সালের ২৮ অগস্ট বি· বি· সি· রেডিও থেকে প্রচারিত হল গুচের এক সাক্ষাৎকার। গুচ জানালেন, তিনি অনুতপ্ত। দক্ষিণ আফ্রিকায় খেলতে যাওয়া মানে এই নয় যে, তিনি বর্ণবিদ্বেষ সমর্থন করেন। তিনি বর্ণবৈষম্যের ঘোরতর বিরোধী।

স্ত্রী ব্রেন্ডা ও তিন মেয়েকে নিয়ে গুচ রীতিমত এক সংসারী মানুষ। বড় মেয়ে হানার বয়স ১০, দুই যমজ মেয়ে, স্যালি ও মাগেন। এই দুই যমজ শিশুর কলকলানি শুনেই গুচের সারাদিন কেটে যায়। একবার তিনি বলেছিলেন, "ইংল্যান্ডের অধিনায়কত্বের চেয়েও বাড়ি ফিরে স্ত্রী ও আমার মেয়েদের নিয়ে সময় কাটাতে ভাল লাগে।"

লর্ডসের নায়ক সেদিনও খেলার শেষে বাড়ি ফিরেছিলেন। পৃথিবী তাঁকে জানিয়েছে উষ্ণ অভিনন্দন, কিন্তু আরও বড় এক অভিনন্দন তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে অন্যত্র।

···বাবার জন্য জেগে বসে আছে স্যালি ও মাগেন। গ্রাহাম গুচ সেখানে ফিরতে চান।

ওভালে অবিস্মরণীয় দুটি নাম সুঁটে, সারওয়াতে

কেনিংটন ওভালে আশ্চর্য এক রেকর্ডের কথা লিখেছেন
সুব্রত সরকার

এবারকার ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজের শেষ টেস্টটি আবার লন্ডনে, কেনিংটনের ওভাল মাঠে। লন্ডনের অন্য টেস্ট-প্রাঙ্গণ লর্ডস আরও বিখ্যাত হলেও, ইংল্যান্ডে সর্বপ্রথম টেস্ট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয় ওভালে, এখন থেকে ১১০ বছর আগে। লর্ডসের যেখানে একটা আভিজাত্যপূর্ণ, নাক-উঁচু ভাব আছে,ক' বছর আগে অবধি ওভালের অনেক কিছুতেই শ্রমিক-সম্প্রদায়ের একটা ছাপ ছিল।

টেমস নদীর দক্ষিণে ডিম্বাকৃতির এই মাঠটির প্রতি এক বিশেষ কারণে ভারতীয়দের দুর্বলতা আছে। উনিশ বছর আগে ওভালে আমরা ইংল্যান্ডের মাটিতে প্রথম একটি টেস্ট জিতে সেবারকার সিরিজে বিজয়ী হই। তবে ওভালের ইতিহাসে ভারতীয়দের অন্য আর একটি খেলা অনেক বেশি স্মরণীয়। ঘটনাটি ১৯৪৬-এর। সারা ইংল্যান্ড তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আতঙ্ক কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। প্রায় পুরো সাত বছর পরে কেনিংটন ওভালে আবার একটি প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট ম্যাচ হচ্ছে। সারে কাউন্টি একাদশের বিরুদ্ধে খেলছে সফরকারী ভারতীয় দল। প্রথম দিন শনিবার, ১১ মে ভারতীয়রা ব্যাট করতে নেমে চা-বিরতির অল্প আগে তাদের নবম উইকেট হারায়, রানসংখ্যা তখন ২০৫। সারের অধিনায়ক বললেন, ইনিংস শেষ হলেই বিরতি হোক।

চন্দ্রশেখর সারওয়াতে

ঐতিহাসিক সেই জুটি

ব্যাটিং অর্ডারের ১০ নম্বর খেলোয়াড় চন্দ্রশেখর সারওয়াতে তখনও কোনও রান করেননি। বেলা চারটে বেজে তিন মিনিটে তাঁকে সঙ্গ দিতে মাঝমাঠে হাজির ৩৩ বছর বয়সী সুঁটে ব্যানার্জি, যাঁর পোশাকি নাম ছিল শরবিন্দুনাথ। সারওয়াতের মতো সুঁটেও আসলে মন্দ ব্যাট করতেন না। সারের অন্যতম ফাস্ট-মিডিয়াম বোলার অ্যালেক বেডসার ন'টির মধ্যে পাঁচটি উইকেট নিয়েছিলেন, তবে সারওয়াতে আর সুঁটে তাঁর ও অন্যদের বল অনায়াসে খেলতে থাকেন। ওভালে উপস্থিত দর্শকরা নড়েচড়ে বসলেন। ইনিংস চট করে শেষ হওয়ার সম্ভাবনা নেই বুঝে সারের অধিনায়ক চা-বিরতি ডাকলেন। দশম উইকেট জুটি তার মধ্যেই ঠিক ১০০ রান যোগ করে ফেলেছে। এই খবর প্রচার হলে কাজ-ফেরত অনেক লোক ওভালে গিয়ে ভিড় বাড়ান। দিনের খেলা শেষ হওয়ার আগে চন্দু সারওয়াতে তাঁর ব্যক্তিগত শতরানে পৌঁছে যান। আর ১৩২ মিনিট ক্রিজে থেকে ১৯০ রানের অপরাজিত পার্টনারশিপের মধ্যে সুঁটে ব্যানার্জি করেন ৮৫ নট আউট।

সুঁটে ব্যানার্জি

সোমবার খেলা ফের শুরু হলে সুঁটেও তাঁর সেঞ্চুরি পান। সকালে প্রায় ঘণ্টাখানেক ব্যাট করার পর শেষ পর্যন্ত তিনি ব্যক্তিগত ১২১ রানে বোল্ড আউট হলেন। সারওয়াতে নট আউট রইলেন ১২৪-এ, আর ভারতীয়দের মোট রান ৪৫৪। দশম উইকেটে ২৪৯ রান ইংল্যান্ডের মাঠে আজও রেকর্ড। আর প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটের অন্য কোনও ইনিংসে একই দলের ১০ আর ১১ নম্বর ব্যাটসম্যান শতরানের কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি।

বিশিষ্ট ক্রিকেট-সমালোচক জন আরলট বি বি সি-র হয়ে সেই ম্যাচের ধারাভাষ্য দিচ্ছিলেন। সম্প্রতি তিনি লিখেছেন, তখনকার ক্রিকেট-বঞ্চিত ইংল্যান্ডে ওই অসাধারণ রেকর্ড দারুণ একটা খবর হয়ে উঠেছিল। ওভালের ইতিহাসে সেইজন্যই সুঁটে-সারওয়াতের নাম, আর ২৪৯ অঙ্কটির বিশেষ স্থান আছে!

সম্ভাবনাময় ফুটবলারদের দেখা যাচ্ছে না কলকাতার লিগে

কলকাতার লিগ ফুটবল নিয়ে আলোচনা করেছেন তানাজি সেনগুপ্ত

কথা হচ্ছিল চিমা ওকোরির সঙ্গে, কেয়াতলায় তাঁর ফ্ল্যাটে বসে। কথায়-কথায় চিমা বললেন, "কলকাতায় আর খেলতে ভাল লাগছে না।" কেন ? প্রশ্নটা করার আগেই চিমা নিজে ব্যাখ্যা দিলেন, "এখান থেকে কিছু শেখার নেই। সবাই শুধু চায় একটা গোল। গোল হলেই হয়ে গেল। কর্মকর্তা থেকে কোচ, ফুটবলার, দর্শক, সবার এক লক্ষ্য। একটা টুর্নামেন্টে এই লক্ষ্যে

গোলে এখনও দেবাশিস মুখার্জি সেরা

লড়াই চলে, দিনের পর দিন শুধু একটা চিন্তা মাথায় রাখলে চলে না।"

কলকাতার ফুটবল নিয়ে চিমা যে বিরক্ত হতে শুরু করেছেন, তা তাঁর কথাতেই স্পষ্ট। এটা তিনি গোপন রাখারও চেষ্টা করেননি। এখন প্রশ্ন, সামগ্রিকভাবে চিমার কথাগুলো কি ঠিক নয় ? কলকাতার বড় তিন প্রধান যে রোমাঞ্চ জাগিয়ে এবারের দলবদলের খেলা খেলেছিলেন, তাতে মনে হয়েছিল, ফুটবলাররা বোধ হয় মাঠে জাদু দেখাবেন। কোচেরা দেখাবেন নতুন পদ্ধতির খেলা।

অধিকাংশ সিনিয়ার ফুটবলার টাকা নিয়ে দর কষাকষির খেলা যত ভাল খেলেছেন, তার শতকরা এক ভাগও মাঠে দেখাতে পারেননি। অধিকাংশ বড় ক্লাবের তারকা ফুটবলাররা কতখানি শারীরিকভাবে 'ফিট', তা নিয়ে এবারে প্রশ্ন উঠেছে। চল্লিশ গজই অনেক ফুটবলার ভাল করে ছুটতে পারেন না। তালেগোলে একটা গোল হয়ে গেলেই এঁদের খেলা শেষ।

কিন্তু কী দেখলাম আমরা ? অধিকাংশ সিনিয়ার ফুটবলার টাকা নিয়ে দর কষাকষির খেলা যত ভাল খেলেছেন, তার শতকরা এক ভাগও মাঠে দেখাতে পারেননি। অধিকাংশ বড় ক্লাবের তারকা ফুটবলাররা কতখানি শারীরিকভাবে 'ফিট' তা নিয়ে এবারে প্রশ্ন উঠেছে। চল্লিশ গজই অনেক ফুটবলার ভাল করে ছুটতে পারেন না। তালেগোলে একটা গোল হয়ে গেলেই এঁদের খেলা শেষ। আর কোচেরা ? সদ্য বিশ্বকাপ দেখার অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ কোনও-কোনও কোচ নিজেকে বিলার্দোর মতো মনে করছেন, তাঁর কাছে কোনও ফুটবলার বারেসি, তো আর একজন দোনাদোনি, অন্যজন স্কিলাচি। কোনওরকমে জিতে নিজের স্ট্রাটেজির প্রশংসায় নিজেই আত্মহারা হচ্ছেন।

কোচ জামশিদ নাশিরির সঙ্গে কথা বলছেন এক ফুটবলার, শুনছেন মুর্শেদ আলি

আর-এক কোচ তো না করতে পারছেন নিজের প্রশংসা, না পারছেন খেলোয়াড়দের সঠিকভাবে মাঠে নামাতে। একটা সরল প্রশ্ন রাখা যাক এই বড় কোচেদের কাছে : বড় ক্লাবরা তো কম তরুণ খেলোয়াড়কে দলে নেয়নি, কিন্তু প্রতিশ্রুতি জাগানোর মতো একজন ফুটবলারও কি কোনও কোচ তৈরি করতে পারলেন এই মরসুমে ? পারেননি, কারণ তাঁরা চেষ্টাই করেননি। সে চেষ্টা করতে গেলে শস্তায় বাজিমাত করা যাবে না যে !

চিমা যে ক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন তার সঙ্গত কারণ ছিল। কয়েকদিন আগেই লিগে প্রথম ইস্টবেঙ্গল হারে মোহনবাগানের কাছে। এবং সবার ধারণা চিমা গোল করতে পারেননি বলেই ইস্টবেঙ্গল হারল। যেন গোল করার একমাত্র দায়িত্ব চিমারই, আর কারও নয়। ইস্টবেঙ্গলের অধিকাংশ ফুটবলারই এবার

চিমা বলছিলেন, "বিশ্বকাপ দেখে নিজেকে ছোট পুকুরের মাছ মনে হচ্ছে।" এটা অনেক ফুটবলারের মানসিকতা। কিন্তু বিশ্বকাপারদের সঙ্গে তুলনার দরকার নেই। লিগে পাঁচ বছর আগেও যে মানের ফুটবল ও ফুটবলার আমরা দেখেছি, এবার কি তাও পাচ্ছি ? অর্থ বাড়ছে, সুযোগ বাড়ছে, প্রচার বাড়ছে, অথচ ভাল ফুটবল ক্রমশ কমে যাচ্ছে।

কলকাতা মাঠের বড় আকর্ষণ চিমা -ছবি : সন্তোষ ঘোষ

জড়তায় ভুগেছেন। বাবু মানি যে ফরওয়ার্ডে খেলেন, তা যেন বলে না দিলে বোঝার উপায় নেই। পায়ের কাজে বিখ্যাত কৃশানু দে, এখন বছরে দু-একদিন বোধ হয় পা-টাকে কাজে লাগান, অধিকাংশ দিনই অবশ্য মাঠে থাকেন। সুদীপ চ্যাটার্জি, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য এবং তরুণ দে-কে এখন অনেক ক্লান্ত বলেই মনে হয়। একমাত্র দেবাশিস সরকার, সুজিত দত্ত আর শঙ্কর সাধু কিছুটা ভাল খেলেছেন—কিন্তু প্রতিশ্রুতি জাগিয়েই না তাঁরা শেষ হয়ে যান ! দেবাশিস বুদ্ধি করে খেলেন, পায়ের কাজেও ভাল। কিন্তু গতিটাকে এখনও ঠিকমতো কাজে লাগাতে পারছেন না। ডিফেন্সে সুজিত আস্থা নিয়ে খেলছেন, কিন্তু কতটা সুযোগ তিনি পাবেন সন্দেহ আছে। শঙ্কর গতবারই মাঝমাঠে মহমেডানের হয়ে চমৎকার খেলেছিলেন। দম অফুরন্ত, এবারে মহমেডান ম্যাচ খেলেছেন বেশ ভাল। কিন্তু বিকাশ পাঁজি সুস্থ থাকলে তাঁর জায়গা পাওয়া নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

লিগ জয়ের প্রধান দাবিদার মোহনবাগানের প্রধান ভরসা বয়স্ক ফুটবলাররাই। প্রশান্ত ব্যানার্জি ইস্টবেঙ্গল ম্যাচে চমৎকার খেলেছেন আর দেবাশিস মুখার্জি সারা লিগটাই অত্যন্ত দক্ষ হাতে মোহনবাগানের গোল সামলাচ্ছেন। উত্তম মুখার্জির দৌড় আছে, কিন্তু শেষ নেই। তবে এ-বছরে উত্তম নিজেকে মধ্যম থেকে উত্তমে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন।

মহমেডানের অধিকাংশ ফুটবলারই এবারে লিগে ব্যর্থ। এর মধ্যে মুর্শেদ আলি মন্দের ভাল। বড় দল বাদে অন্য দলগুলোর কেউই তেমন নজর কাড়তে পারেননি এখন পর্যন্ত। কুমারটুলির শীর্ণ তরুণ ব্যাক দেবাশিস দাস অবশ্য কিছুটা দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রায় একক দক্ষতাতেই রুখে দিয়েছেন চিমার মতো ফরওয়ার্ডকে। কিন্তু সেরকমভাবে কেউই উঠে এলেন না, যাঁর কথা বড় মুখে বলা যেতে পারে।

চিমা বলছিলেন, "বিশ্বকাপ দেখে নিজেকে ছোট পুকুরের মাছ মনে হচ্ছে।" এটা অনেক ফুটবলারের মানসিকতা। কিন্তু বিশ্বকাপারদের সঙ্গে তুলনার দরকার নেই। লিগে পাঁচ বছর আগেও যে মানের ফুটবল ও ফুটবলার আমরা দেখেছি, এবার কি তাও পাচ্ছি ? অর্থ বাড়ছে, সুযোগ বাড়ছে, প্রচার বাড়ছে অথচ ভাল ফুটবল ক্রমশ কেন কমে যাচ্ছে—এই নিয়ে ভাবনার সময় কি কেউ পাচ্ছেন না ?

নতুন কোচ গাসকোয়েনকে পছন্দ করছেন না

গাসকোয়েন যেখানে,বিতর্কও সেখানে।

লিখেছেন **সব্যসাচী সরকার**

এবারের বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে টাইব্রেকারে পশ্চিম জার্মানির কাছে হেরে যাওয়ার পরের দিন ইংল্যান্ডের বিখ্যাত পত্রিকা 'ডেইলি মিরর'-এ পল গাসকোয়েন-এর আধ পাতাজোড়া ছবি প্রকাশিত হয়। টাইব্রেকারের ঠিক আগে তোলা ছবিটিতে দেখা যায় মুষ্টিবদ্ধ দুটি হাত আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছেন গাসকোয়েন, আর তাঁর চোখ দিয়ে নেমে আসছে জলের ধারা। দর্শকদের অভিনন্দন গ্রহণ করছেন শেষবারের মতো, টাইব্রেকারের আগে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন তাঁদের। ততক্ষণে তিনি জেনে গেছেন টাইব্রেকারে ইংল্যান্ড জিতলেও বিশ্বকাপ ফাইনালে তিনি এবার আর খেলতে পারবেন না। পর-পর দুটো ম্যাচে হলুদ কার্ড দেখেছেন তিনি। ডেইলি মিররে প্রকাশিত ছবিটি এত জনপ্রিয় হয়েছিল যে, প্রায় প্রতিটি ইংরেজ ফুটবলপ্রেমী তাদের প্রিয় গাজ্জা-র (ইংল্যান্ডে গাসকোয়েনকে আদর করে এই নামে ডাকা হয়) এই ছবিটি কেটে দেওয়ালে টাঙিয়ে রেখেছিল। পাঠকদের অনুরোধে পরের দিনের কাগজে ওই একই ছবি আবার প্রকাশ করতে হয়। এই একটি ঘটনা থেকেই স্পষ্ট, ইংল্যান্ডে গাসকোয়েনের জনপ্রিয়তা কতখানি।

বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার পর ইংল্যান্ডে এখনও জোর আলোচনা চলছে এবারের বিশ্বকাপে সেরা মিডফিল্ডার কে ? জার্মানির লোথার ম্যাথাউস, না ইংল্যান্ডের গাজ্জা ? ইংল্যান্ডের সাংবাদিকরা এখন এ-কথা প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লেগেছেন যে, গাসকোয়েনই বিশ্বকাপের সেরা মিডফিল্ডার। গাসকোয়েন যে বিশ্বকাপে রীতিমত হইচই ফেলে দিয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ইতালিই হোক আর ইংল্যান্ডই হোক, গাসকোয়েন যেখানে,বিতর্কও সেখানে। বিশ্বকাপের আগে ইংল্যান্ডের একটি রেস্তরাঁয় এক ভদ্রলোকের সঙ্গে গাজ্জার সামান্য কথা কাটাকাটি হয়। গাজ্জা ভদ্রলোককে এমন ধোলাই দেন যে, ভদ্রলোককে হাসপাতালে পাঠাতে হয়। পুলিসের খাতায় নাম ওঠে গাসকোয়েনের।

ইতালিতেও গাসকোয়েনের কীর্তি কিছু কম নয়। একমুহূর্তও স্থির হয়ে থাকতে পারেন না তিনি। তাঁর যিনি 'রুমমেট' হন, তাঁর দুর্ভোগের আর শেষ থাকে না। সহখেলোয়াড় বাথরুমে ঢুকলে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে কেটে পড়েন তিনি, আঠালো চুইংগাম আটকে রাখেন বসবার চেয়ারে। আরও কত কী যে তিনি করতে পারেন তা বলে শেষ করা যায় না। মোট কথা, গাজ্জার মাথাটা সবসময়ই দুর্বুদ্ধির ডিপো। এবার ইতালিতে বিশ্বকাপ চলার সময় হোটেলের লনে চুপচাপ বসে 'সানবাথ' নিচ্ছিলেন তিনি। মজা করার ছলে হঠাৎ সহখেলোয়াড় ক্রিস ওয়াড্‌ল এক বিরাট চকোলেট কেক গাজ্জার মুখে মাখিয়ে দেন। কোথায় মজাটা উপভোগ করবেন তা নয়, গাজ্জা রেগেমেগে ছুটে গিয়ে কেকটির অবশিষ্টাংশ চিত্র-সাংবাদিক আর টিভি ক্যামেরার সামনেই ওয়াড্‌লের মুখেও মাখিয়ে দেন। আর-একবার ডিফেন্ডার পল পার্কার যখন টেলিভিশনে সাক্ষাৎকার দিতে যাচ্ছেন, কাগজের কাপ ছুঁড়ে তাঁকে অতিষ্ঠ করে তোলেন গাজ্জা। এর ফল কিন্তু শুভ হয়নি। ইতালির সংবাদপত্র গাসকোয়েনকে 'গুণ্ডা' আখ্যা দেয়। ইতালিতেই সোফার ওপর পা তুলে বসে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছিলেন তিনি। তাঁকে পা নামিয়ে বসতে বলায় গটগট করে হল ছেড়ে বেরিয়ে যান।

সেমিফাইনালের পর কেঁদে ফেলেছিলেন দুরন্ত গাজ্জা। ইংল্যান্ড হেরে যাওয়ার জন্য তো বটেই, কিন্তু তার চেয়েও বড় কারণ, রবসনকে আর কোনওদিনই কোচ হিসেবে পাবেন না তিনি। এই রবসনই তো তাঁকে তুলে এনেছেন পাদপ্রদীপের আলোয়। স্নেহময় পিতার মতো সবসময়ই তিনি আগলে রেখেছিলেন অনমনীয় 'গাজ্জা'কে, তাই আমরা দেখতে পেয়েছি অমন মনমাতানো ফুটবল।

ইংল্যান্ডের নবনির্বাচিত কোচ গ্রাহাম টেলর কিন্তু রবসন নন। শৃঙ্খলা এবং ব্যাকরণসম্মত ফুটবলই তাঁর কোচিং-এর শেষ কথা। তিনি সোজাসুজিই জানিয়েছেন, দলে কোনওরকম বিশৃঙ্খলা বরদাস্ত করবেন না। তাঁর মতে, ফুটবলটা এগারোজনের খেলা, একজনের নয় এবং সবাই মারাদোনা নয়। আসলে তিনি কটাক্ষ করেছেন গাজ্জাকেই। সবাই জানে, গাসকোয়েন পায়ে বেশিক্ষণ বল রাখেন, স্কিলই তাঁর খেলার বৈশিষ্ট্য। এ নিয়েই নাকি বর্তমানে মন কষাকষি চলছে গাসকোয়েন আর গ্রাহাম টেলরের মধ্যে। এখন প্রশ্ন হল, এভাবে কি বেঁধে রাখা যাবে দুরন্ত গাজ্জাকে ?

গাসকোয়েনের জুড়ি নেই

একটি অটোগ্রাফের গল্প

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

নামডাক হোক না যত
ডাকনাম তাঁর স্টেফানি,
মনটাও শিশুর মতো
ভয়ানক অভিমানী।

লোকে কয় টেনিস দেবী,
তাতে তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই,
মা-বাবার কাছে গেলেই
স্টেফি গ্রাফ শুধুই স্টেফি।

খেলাতে হারলে তিনি
লোকে যেই মন্দ বলে,
স্টেফি কন চোখের জলে :
"কোনো তো দোষ করিনি !"

তখুনি দুয়োর এঁটে
পিয়ানোয় সুরের লহর
তুলে যান, এইভাবেতে
ভুলে যান লাঞ্ছনা ওঁর।

রাস্তায় নামলেই ফের
একাকার জনস্রোতে
সকলেই স্টেফি গ্রাফের
স্বাক্ষর চায় কুড়োতে ;

স্টেফি যান দৌড়ে তখন
পালিয়ে, অটোগ্রাফের
লোভীরাও পিছন-পিছন
ছুটে যায় ফড়িং-লাফে।

একবার একটি তরুণ
সহজেই দৌড়ে গিয়ে
বলে, "আপনাকেই নিয়ে
বাংলায় ছড়া শুনুন।"

ছড়াটা শুনেই বেজায়
খুশিতে ছোট্ট মেয়ে
স্টেফি তাঁর হাত-ঝুলিটায়
নিজের এক চিত্র পেয়ে

আঁকলেন তাতেই শেষে
স্বাক্ষর, বিনা খামেই
পাঠালেন সুদূর দেশে
আনন্দমেলার নামে।

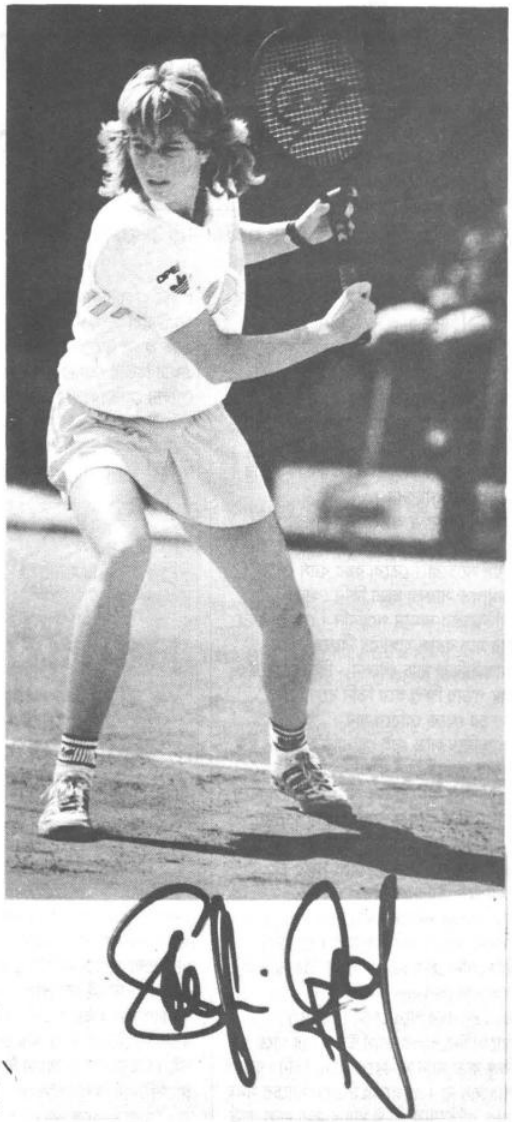

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

'আনন্দমেলা' ১ এপ্রিল ১৯৮৭ সংখ্যায় স্টেফি গ্রাফকে নিয়ে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত লিখেছিলেন 'খেলতে খেলতে' কবিতাটি। কবিতাটি স্টেফিকে পড়ে শুনিয়েছিলেন এক তরুণ। স্টেফি খুশি হয়ে তাঁর এই স্বাক্ষরিত ফোটোটি পাঠিয়েছেন।

মারাদোনার বিদায়ে বিশ্ব-ফুটবল দরিদ্র হয়ে গেল

প্রত্যয় আর সাহসের অন্য নাম মারাদোনা। লিখেছেন কৃশানু ভট্টাচার্য

খেলা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ভিড়ে ঢাকা পড়ে গিয়েছিলেন ছোটখাটো মানুষটি। কে যেন চট করে তাঁকে কাঁধে তুলে নিয়েছিল। সবাই চাইছিল তাঁর হাতে হাত মেলাতে, তাঁকে একটু ছুঁয়ে দেখতে। ছোট্ট মানুষটির মুখে সেদিন ছিল বাঁধভাঙা হাসি। আনন্দে সেদিন আত্মহারা তিনি। অনেক কিছু প্রমাণ করার ছিল তাঁর। তিনি পেরেওছিলেন।

সিজার মেনোত্তি আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপ দল থেকে তাঁকে বাদ দিয়েছিলেন। তখন তাঁর বয়স সতেরো। তেরো বছর বয়স থেকে ক্রমাগত সাফল্য ছাড়া তিনি কোনও অভিজ্ঞতার সামনে পড়েননি। ষোলো বছর চার মাস বয়সে হাঙ্গারির বিরুদ্ধে প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাদ পড়ায় ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি দলের সদর দফতর থেকে বেরিয়ে যান।

দোষ দিয়ে লাভ নেই মেনোত্তির। তিনি ছক কষেই রেখেছিলেন কীভাবে সতেরো বছরের ছেলেটিকে অভিজ্ঞতার আগুনে ঝলসে নিয়ে পাকাপোক্ত করে তুলবেন। প্রথমে দক্ষিণ আমেরিকা যুব প্রতিযোগিতায়, তারপর জাতীয় দলের সঙ্গে ইউরোপ সফর। অবশেষে টোকিওয় বিশ্ব যুব-চ্যাম্পিয়ানশিপের মধ্য দিয়ে যখন বেরিয়ে এলেন, তখন তিনি বিশ্বখ্যাত। স্পেনের বার্সিলোনা ক্লাব ১৯৭৯ সালে তাঁর সঙ্গে ৩০ লক্ষ পাউন্ডের এক চুক্তি করে।

এর তিন বছর পরে স্পেন বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা দলের জার্সি উঠল তাঁর গায়ে। কিন্তু কড়া ম্যান মার্কিংয়ের জন্য তিনি খেলতে পারলেন না। ব্রাজিলের বিরুদ্ধে ম্যাচের সময় ব্যাক বাতিস্তাকে লাথি মারার জন্য লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন। এর ছ' বছর বাদে ইতালির নেপোলি ক্লাব তাঁকে দশ কোটি টাকারও বেশি দাম দিয়ে কেনে। দু' বছর ইতালির লিগে খেলতে-খেলতে ওদের ক্যাটানেসিয়ান পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হলেন। ক্যাটানেসিয়ান পদ্ধতির অর্থ জমাটবাঁধা ডিফেন্স ও ম্যান-টু-ম্যান মার্কিং। এরই ফসল তুললেন মেক্সিকো বিশ্বকাপে। একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর দল নিয়ে খেলতে গেলেন মেক্সিকো। স্পেনের বিশ্বকাপে এই তরুণটি তাঁর ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করতে পারেননি। কিন্তু মেক্সিকোতে পেলেন। ঝলমলে খেলা দিয়ে একাই শেষ করে দিলেন বিপক্ষ দলগুলিকে। প্রমাণ করে দিলেন বিশ্বের এক নম্বর ফুটবলারের নাম দিয়েগো আরমান্দো মারাদোনা। কিন্তু চার বছর পরে এই মারাদোনারই অন্য রূপ। ইতালির বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার পর থেকেই সর্বত্র একই আলোচনা। মারাদোনা আর সেই মারাদোনা নেই। গতবারেও মেক্সিকো বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার সেমিফাইনালে ওঠার কথা ছিল না। "মারাদোনাকে আটকালেই, আটকে যাবে আর্জেন্টিনা।" কোচেদের এই স্ট্রাটেজি কোনও কাজেই লাগেনি। আটকানো যায়নি মারাদোনাকে। তাই কোচ বিলার্দো বলেছিলেন, "আমার দলে খেলবে মারাদোনা আর বাকি দশজন।"

ইতালি বিশ্বকাপে এবারে কিন্তু তাঁকে আটকানো গেছে। প্রতিটি দল তাঁকে রেখেছিল ডবল-মার্কিংয়ে। সময়-সময় তিনজনে মিলেও। বল নিয়ে মারাদোনা এগিয়ে গেলেই পেছন থেকে ল্যাং মেরে অথবা স্লাইডিং ট্যাকলের নাম করে তাঁকে ফেলে দেওয়া হয়েছে। ক্যামেরুন আর রুমানিয়ার খেলোয়াড়রা তাঁর ওপর রীতিমত আক্রমণ করেছিল। কিন্তু দমে যাননি মারাদোনা। যে পায়ের আঘাতে সাধারণ মানুষ হাঁটতে পর্যন্ত পারেন না, সেই আঘাত নিয়েও তিনি খেলে গেলেন।

ইতালি বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার আগে বলেছিলেন, "মেক্সিকোর থেকেও আমি ভাল কণ্ডিশনে আছি। এবারও চ্যাম্পিয়ান হব।" কিন্তু একটা ভাঙাচোরা দল নিয়ে কি আর বিশ্বচ্যাম্পিয়ান হওয়া যায়? যে ভালদানো আর লুই ব্রাউন গতবার মারাদোনার পাশে মানানসই খেলেছিলেন, তাঁরা অবসর নেওয়ায় এবার দলে ছিলেন না। বুরুচাগার ফর্ম একেবারেই ছিল না। আর্জেন্টিনা দলে এবার সত্যি-সত্যিই ছিলেন মারাদোনা আর

ববি চার্লটন

বিলার্দো

মেনোত্তি

কোচ মেনোত্তির জন্য সতেরো বছর বয়সে বিশ্বকাপ-দলে স্থান পাননি মারাদোনা। বিলার্দোর সময় মারাদোনা হয়ে ওঠেন বিশ্ব-ফুটবলের মেগাস্টার। প্রতিপক্ষ সব দলের কোচ ও ম্যানেজাররা তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তাঁরা বলেন, "মারাদোনার মতো কাউকে পেলে আমরা বিশ্বজয় করতে পারতাম।" এই দলে আছেন ববি চার্লটন ও ববি রবসন।

দিয়েগো মারাদোনা

বাকি দশজন। কিন্তু তবুও তিনি আর্জেন্টিনাকে ফাইনালে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন। নিজের চোট-আঘাতকে উপেক্ষা করেও তিনি খেলেছিলেন। মারাদোনা আহত হলেও সব দলই তাঁর পেছনে একাধিক মার্কার রেখেছিল। একাধিক মার্কার থাকা মানেই কিছুটা অঞ্চল ফাঁকা হয়ে যাওয়া। সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে সতীর্থদের গোল করার উপযোগী বল বাড়িয়ে গেছেন তিনি, নির্ভুল অভ্রান্ত নিশানায়। প্রত্যয় আর সাহসের অন্য নাম মারাদোনা।

মারাদোনা কি পেলের চেয়েও বড় ? চার বছর আগে মারাদোনার প্রতিভা জরিপ করতে গিয়ে মেনোত্তি বলেছিলেন, "যদি কারও সঙ্গে তুলনা করতেই হয়, তা হলে পেলে আর পুসকাসের কথা মনে আসে। তবে ও ওই দু'জনের কারও মতো নয়— ও হল প্রথমে মারাদোনা, নিজেই নিজের মালিক।"

কিন্তু ইতালি বিশ্বকাপেই প্রমাণিত হয়ে গেছে কেন তাঁকে এই শতাব্দীর সবচেয়ে বড় খেলোয়াড়ের সম্মানটা দেওয়া হয়। পেলেও ছেষট্টির বিশ্বকাপে পর্তুগালের কড়া ট্যাকলিংয়ে আহত হয়ে কাঁদতে-কাঁদতে মাঠ ছেড়েছিলেন। কিন্তু জখম পায়ে যেভাবে অবলীলাক্রমে তিনজনকে কাটিয়ে ক্যানিসিয়াকে এমন থু বাড়ালেন, তা গোল হয়ে গেল। মারাদোনার ওই একটি মুভই ভেঙে চুরমার করে দিল ব্রাজিলের বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন।

সারা টুর্নামেন্টে যে মানুষটিকে ৫০ বার ফাউল করা হয়েছে, তিনিই আবার ইতালির বিরুদ্ধে দেখালেন তিনি এখনও ফুরিয়ে যাননি। হয়তো ছিয়াশির তুলনায় একটু ঔজ্জ্বল্য হারিয়েছেন। কিন্তু তিনি এখনও মারাদোনাই। তাঁর বাড়ানো পাস থেকেই শেষ অবধি আর্জেন্টিনা গোল শোধ করে দেয়।

কিন্তু শেষ স্বপ্নটা তাঁর আর পূর্ণ হল না। চেয়েছিলেন আর-একবার আর্জেন্টিনাকে বিশ্বজয়ী করতে। আর-একবার প্রমাণ করতে, বিশ্বে তিনিই সেরা। কিন্তু জীবনের শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচে তাঁকে কিছু করতে দেখা গেল না।

ফুটবল নামের শিল্পকর্মে যাঁরা দক্ষতা দেখিয়ে পৃথিবীখ্যাত— সেই পেলে, বেকেনবাওয়ার বা ক্রুয়েফের পর মারাদোনাই ছিলেন শেষ খেলোয়াড়, যিনি তাঁর বাঁ পা দিয়ে আর কখনও আমাদের শিল্প দেখাতে আসবেন না। তাঁর বিদায়ের সঙ্গে-সঙ্গে বিশ্ব-ফুটবল অনেকটা দরিদ্র হয়ে গেল।

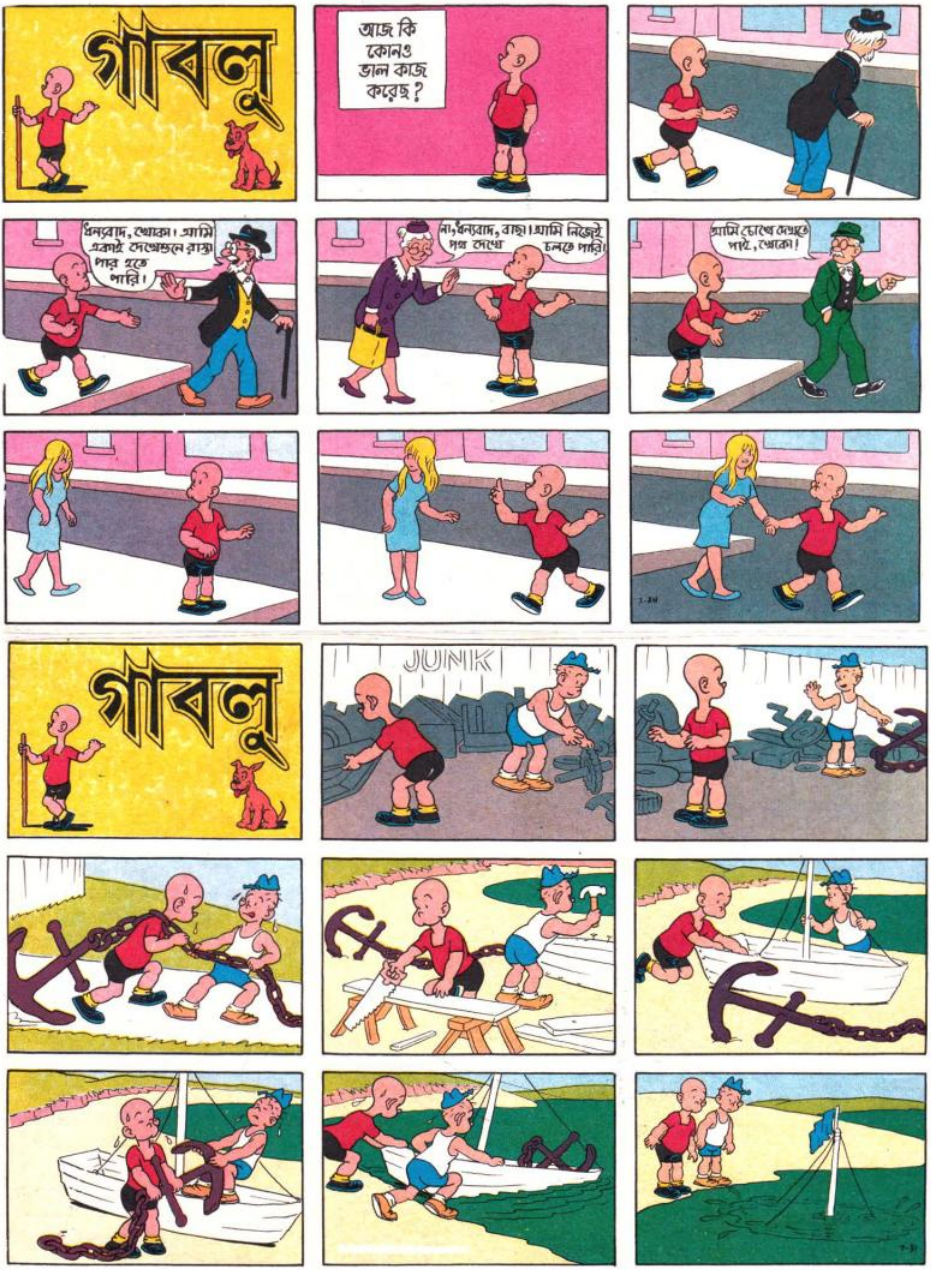
গাবলু
আজ কি কোনও ভাল কাজ করেছ?
ধন্যবাদ, খোকা। আমি একাই দেখেশুনে রাস্তা পার হতে পারি।
না, ধন্যবাদ, বাছা। আমি নিজেই পথ দেখে চলতে পারি।
আমি চোখে দেখতে পাই, খোকা!
গাবলু
JUNIK

শিবাজি গঙ্গোপাধ্যায়

কুমিতে দাচি

কিওকুশিন ক্যারাটের বিভিন্ন রকম দাঁড়ানোর ভঙ্গি, জাপানি ভাষায় যাকে বলে 'দাচি', তাই নিয়ে আমি কয়েকটি সংখ্যায় আলোচনা করেছি। এবারের সংখ্যাতেও আমি আর-একটি দাঁড়ানোর ভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করব। এর পরের সংখ্যা থেকে পা দিয়ে আঘাত করার কৌশল নিয়ে আলোচনা শুরু করব। ক্যারাটে কথার মানে যদিও খালি হাতে আত্মরক্ষার পদ্ধতি, কিন্তু পা দিয়ে প্রতিপক্ষকে আঘাত করার কৌশলও বিশেষ দরকারি ও গুরুত্বপূর্ণ। এবারের দাঁড়ানোর ভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করার আগে কয়েকটি কথা জানাচ্ছি। অনেক পাঠক-পাঠিকা ক্যারাটে শেখার ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়ে আমাদের অনুশীলন-কেন্দ্রের খবরাখবর জানতে চান। তাঁদের জন্য জানাই যে, আমাদের অনুশীলন কেন্দ্র (প্রধান শাখা) ভবানীপুর হরিশ পার্কে প্রতি রবিবার সকালে এবং মঙ্গল ও শুক্রবার সন্ধেবেলা ক্যারাটে শেখানো হয়।

যাক, এবার আমি যে দাঁড়ানোর ভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করছি তার জাপানি নাম 'কুমিতে দাচি'।

কুমিতে দাচি : এর ইংরেজি মানে হল ফাইটিং স্টান্স, বাংলায় বলা যায়, যে ভঙ্গি থেকে প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াই করা হয়। আগেও বলেছি, আবার বলছি, কিওকুশিন ক্যারাটের দাঁড়ানোর ভঙ্গিগুলো শুরুতে ইওই দাচি থেকে শুরু করতে হবে। প্রথমে ঠিকভাবে ইওইদাচিতে দাঁড়াতে হবে—হাত দুটো শরীরের দু'পাশে একটু সামনের দিকে মুঠো শক্ত করে দাঁড়িয়ে তারপর পা দুটো কাঁধ সমান চওড়া করে পায়ের পাতা দুটো সমান্তরালভাবে রেখে দাঁড়াতে হবে। এইবার প্রথমে বাঁ পা-টাকে সামনের দিকে কিছুটা এগিয়ে নিয়ে পায়ের পাতা সামনের দিকে সোজা করে রাখতে হবে। ডান পায়ের পাতা একই জায়গায় রেখে গোড়ালিটাকে ভেতরদিকে ঘুরিয়ে (৪৫-৬০ ডিগ্রি) রাখতে হবে। দু' পায়ের হাঁটু একটু মুড়ে দাঁড়াতে হবে। দু' পায়ের ওপর শরীরের ওজন সমানভাগে ভাগ করে দাঁড়াতে হবে। কোমর থেকে শরীরের ওপরভাগ ডান দিকে ৪৫ ডিগ্রি ঘুরে থাকবে। পায়ের অবস্থান ঠিক করে রাখার সঙ্গে হাত দুটোকে তুলে ওপরে এনে মুখের সামনে মুঠো শক্ত করে রেখে শরীরের ওপর ভাগ সোজা করে দাঁড়াতে হবে। হাতের মুঠো কানের সমান উচ্চতায় থাকবে। এই অবস্থায় শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শক্ত করে দাঁড়ানো একেবারেই ঠিক নয়, শরীরকে সহজ করে দাঁড়াতে হবে, চোখ সামনের দিকে সোজা রেখে। এই দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে বাঁ পা এগিয়ে যেমন বাঁ দিক করে দাঁড়ানো যায়, তেমনই আবার ডান পা-কে এগিয়ে বাকি সব ব্যাপারগুলো একইভাবে করে ডান দিকে দাঁড়ানোর অভ্যাস করতে হবে। এই দাঁড়ানোর ভঙ্গিটিতে বিশেষভাবে একটি ব্যাপার খেয়াল রাখতে হবে যে, বাঁ পা বা ডান পা যখন এগিয়ে এই ভঙ্গিতে দাঁড়াতে হচ্ছে, তখন যে পা এগনো হচ্ছে সেটা যেন খুব বেশি এগিয়ে না যায়। পা ততখানি এগনো দরকার, যতখানি এগোলে নিজেকে বেশ স্বচ্ছন্দ মনে হয় এবং চটপট নড়াচড়া করা যায়।

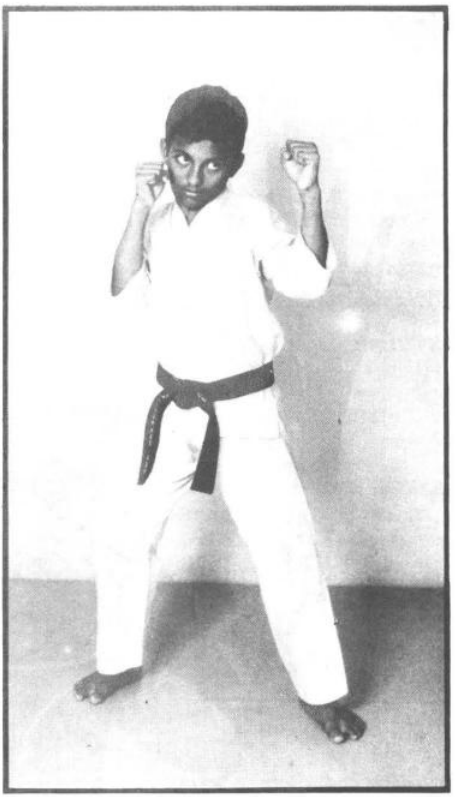

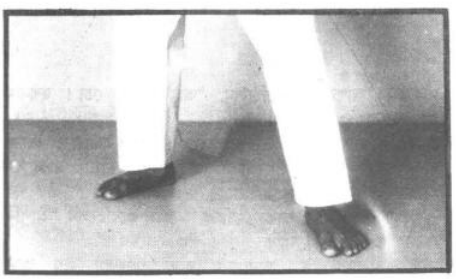

ফোটো : উৎপল সরকার

টেবিল ল্যাম্পের নীচে কাগজটা মেলে ধরে রজনীবাবু শিহরিত হয়ে উঠলেন। কাগজের ওপর হাতের পাঞ্জার ছাপ। রজনীবাবু চিৎকার করে হরিকে ডাকলেন। ছুটতে-ছুটতে হরি এল। তিনি অসহিষ্ণু গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় ছিলি ?"

হাত কচলাতে-কচলাতে হরি বলল, "আজ্ঞে বাবু, নীচের ঘরে।"

রজনীবাবু এবার ধমক দিয়ে বললেন, "নীচের ঘরে কী করছিলি ? ঘুমোচ্ছিলি নিশ্চয়ই।"

হরি জবাব দিল না। মাথা নিচু করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। রজনীবাবু সিগারেট টানতে-টানতে ঘরের ভেতরে পায়চারি করতে লাগলেন। আর আপনমনে গজরাতে-গজরাতে বলতে থাকলেন, "আশ্চর্য তুই ! নতুন জায়গা। কোথায় চোখ-কান খুলে রেখে সজাগ থাকবি তা নয়, পড়ে-পড়ে ঘুমোচ্ছিস !"

কলকাতা থেকে দুশো পঁয়ষট্টি কিলোমিটার দূরে এই জায়গাটার নাম পাহাড়গড়। কয়েকদিন আগে তিনি এই জায়গাটার নাম শোনেন। যে ভদ্রলোকের জন্য এখানে আসা সম্ভব হয়েছে তাঁর সঙ্গে সাতদিন আগেও রজনীবাবুর আলাপ ছিল না।

সাতদিন আগে এক সকালবেলায় একজন রোগা ভদ্রলোক রজনীবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তাঁর নাম আকাল মল্লিক। রজনীবাবুর মতন রাশভারী মানুষও না হেসে পারেননি। হাসতে-হাসতে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "অদ্ভুত নাম তো ! ছদ্মনাম বুঝি ?"

একগাল হেসে ভদ্রলোক বললেন, "আজ্ঞে না, এটা ঠাকুমার দেওয়া নাম। আকালের সময় আমার জন্ম কিনা, তাই।" এর পর আকাল মল্লিক জিজ্ঞেস করেছিলেন, "আপনি নাকি ভূতের গল্প লেখেন ?"

অন্যসময় হলে এইরকম প্রশ্ন শুনে রজনীবাবু চটে যেতেন। কিন্তু এখন তিনি রাগ না করে মুচকি-মুচকি হাসতে-হাসতে বললেন, "হ্যাঁ। কেন ?"

আকাল মল্লিক বললেন, "আপনাকে সাহায্য করতে এসেছি।"

এবার রজনীবাবু জোরে হেসে উঠলেন, "সাহায্য ? কীরকম সাহায্য ?"

ভদ্রলোক বললেন, "সে-কথা এক্ষুনি

আকালের ভূত

বাণীব্রত চক্রবর্তী

নয়। দু-চার দিন বাদে এসে বলব। বরং আমাকে এককাপ চা খাওয়ান।"

রজনীবাবু সত্যিই আজ অন্যরকম। হরিকে ডেকে চায়ের ফরমাশ করলেন। হরি চা ও শিঙাড়া নিয়ে এল।

আকাল মল্লিক পর-পর পাঁচটি শিঙাড়া খেয়ে ফেললেন। তারপর চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, "অনেকদিন থেকে আপনার কাছে আসব-আসব করছিলুম। কিন্তু আসা আর হয়ে উঠছিল না। আজ ছুটির দিন দেখে চলে এলুম।" খানিকক্ষণ চুপ থেকে বললেন, "আপনার চেয়ে বয়সে আমি ছোট।"

রজনীবাবু বললেন, "আপনার জন্ম ১৯৪৩ সালে যখন, তখন তো ছোট বটেই।"

আকাল মল্লিক যেন চমকে উঠলেন, "আশ্চর্য! আপনি আমার জন্মসালটা জানলেন কেমন করে?"

রজনীবাবু হেসে ফেললেন, "বাহ্। আপনিই তো বললেন আপনার জন্ম আকালের সময়।"

ভদ্রলোক লজ্জা পেলেন বলে মনে হল, আবার নিজের কথা বলতে শুরু করলেন, "দেখুন, ওসব গপ্পো-টপ্পো পড়ার ধাত আমার নেই। ছা-পোষা কেরানি বলতে যা বোঝায়, আমি তাই। তবে আমার ছেলে পটল গোগ্রাসে আপনার লেখা পড়ে। ক্লাস নাইনের ছেলে কোথায় পড়ার বই মুখে নিয়ে বসে থাকবি, তা নয়। রাতদিন খালি গল্পের বই। একদিন তো রেগেমেগে পটলকে এই মারি তো সেই মারি। কী এমন বই বাপু যে, নাওয়া-খাওয়া ভুলে বই নিয়ে বসে আছিস? তা শুনে পটল বলে, এ-বই নাকি আমিও যদি পড়ি তা হলে নাওয়া-খাওয়া ভুলে যাব।

"সেদিন রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর পটলের কাছ থেকে আপনার লেখা গল্পের বইটা নিয়ে শুয়ে-শুয়ে পড়তে লাগলুম। পটল মিথ্যে বলেনি। বেড়ে গপ্পো লেখেন মশাই। একবার ধরলে শেষ না করে ওঠা যায় না। তখনই ভাবলুম আপনাকে সাহায্য করব। আপনাকে মেটিরিয়াল দেব। দেখি কেমন গপ্পো লেখেন।" একটানা অনেকক্ষণ কথা বলে আকাল মল্লিক থামলেন।

রজনীবাবু সিগারেট এগিয়ে দিলেন। ভদ্রলোক হাত নেড়ে বললেন, "মাফ করবেন। বেশি সিগারেট খাই না। নেশা বলতে চা।"

রজনীবাবু নিজে একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, "আপনার চা তো শেষ হয়ে গেছে। বসুন। হরিকে আবার চা করতে বলি।"

আকাল মল্লিক ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন। "না, আজ নয়। সামনের দিন এসে খাওয়া যাবে।"

"তা বলে এক্ষুনি উঠবেন নাকি? কই, মেটিরিয়াল দেবেন বললেন, দিন?"

"না, আজ নয়। দিন চারেক বাদে এসে দেব।"

কথা রেখেছিলেন আকাল মল্লিক। চারদিন বাদে আবার এসে হাজির। সেদিন ছুটির দিন নয়। বৃহস্পতিবার। এসেই জানিয়ে দিলেন, "আজ আপিসে ডুব মারলুম। আপনার এখানে দুটি ঝোলভাত খাব।"

রজনীবাবু খুব খুশি হয়ে হরিকে বাজারে পাঠালেন।

আকাল মল্লিককে দেখলে মনে হয় ভদ্রলোক যেন ধুঁকছেন। শুধু রোগা নন, চেহারায় কেমন যেন একটা রুগ্‌ণ ভাব। মোট কথা ভদ্রলোক যেন মূর্তিমান আকাল। তাঁর চোখে-মুখে বুভুক্ষু ভাব।

ভদ্রলোক যখন ভাত খেতে বসলেন, তাঁকে দেখে রজনীবাবু চমকে উঠলেন। এমনভাবে ভাত খাচ্ছিলেন তাতে মনে হয় উনি যেন কতদিন খাননি।

রজনীবাবুর মনে হল, আকাল তাঁকে মিথ্যে কথা বলেছেন। তিনি মোটেই ছা-পোষা কেরানি নন। হতভাগ্য দরিদ্র মানুষ।

খাওয়া-দাওয়ার পর আকাল মল্লিক রজনীবাবুর কাছ থেকে একটা সিগারেট নিয়ে ধরালেন। কিছুক্ষণ সিগারেট টেনে রজনীবাবুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি পাহাড়গড়ের নাম শুনেছেন?"

"পাহাড়গড় ? সেটা আবার কোথায় ?"

"খুব বেশি দূরে নয়। এখান থেকে দুশো পঁয়ষট্টি কিলোমিটার দূরে। শেয়ালদা থেকে ট্রেনে চেপে পৌঁছতে হবে নিমপাট্টা স্টেশনে। সেখান থেকে বাসে চেপে পাহাড়গড়। আপনাকে সেখানে যেতে হবে। সেখানে একটা ভুতুড়ে বাড়ি আছে। ওই বাড়িতে পাঞ্জা ভূত থাকে।"

"পাঞ্জা ভূত ! সে আবার কীরকম ভূত ?"

"সেটা বলতে পারব না সার। তাকে কেউ দ্যাখেনি। তবে তার পাঞ্জার ছাপ অনেকেই দেখেছে।"

"পাঞ্জার ছাপ ? সেটা আবার কী।"

"মানে হাতের ছাপ। পাহাড়গড়ের ওই বাড়িতে গিয়ে থাকুন। তা হলে সব বুঝতে পারবেন। দেখবেন বইয়ে, সাদা কাগজে, এমনকী বিছানায়-বালিশে মাঝে-মাঝে একটা হাতের ছাপ পড়ে যাচ্ছে। কে কখন এইভাবে পাঞ্জার ছাপ দিয়ে যাচ্ছে আজ পর্যন্ত এই রহস্য কেউ উদ্ধার করতে পারেনি। সবাই বলে ওটা নাকি পাঞ্জা ভূতের কীর্তি।"

রজনীবাবু হো-হো করে হেসে উঠলেন।

"আপনি হাসছেন ? ভাবতেই পারিনি আপনি হাসবেন। আপনাকে অন্যরকম ভেবেছিলুম। আপনি ভূতের গপ্পো লেখেন। কত হানাবাড়িতে রাত কাটিয়েছেন। কত অভিজ্ঞতা আপনার। আমার মতো কত লোকের কাছে খবর পেয়ে কত পোড়ো বাড়িতে ছুটে গেছেন। আমি গরিব বলে আমার কথাটা বিশ্বাস করলেন না ?"

রজনীবাবুর হাসি থেমে গেল। সত্যি তো, তিনি হাসছেন কেন ? ভদ্রলোক যা বলছেন তা তো মিথ্যে নয়। লজ্জিত মুখে রজনীবাবু বললেন, "কিছু মনে করবেন না, বলুন, পাহাড়গড়ের কথা।"

"যা বলবার তা তো বলেই দিলুম। এখন বলুন সেখানে যাবেন কি না। যদি রাজি থাকেন তা হলে ব্যবস্থা করব।"

"বেশ, আমি রাজি আছি।"

রজনীবাবু একদিন হরিকে নিয়ে পাহাড়গড়ের ভুতুড়ে বাড়িতে চলে এলেন। আকাল মল্লিক বলেছিলেন, "ওই বাড়িতে যখন যাচ্ছেন আপনাকে কয়েকটা স্পষ্ট কথা বলে দিই। প্রথমেই জানাই, আমি কিন্তু আপনার সঙ্গে পাহাড়গড়ে যেতে পারব না। আর যে-বাড়িতে যাচ্ছেন সে-বাড়ির মালিক আমি নই। ওটা আমাদের আপিসের অক্ষয়বাবুর বাড়ি। ওই বাড়িটা নিয়ে ভদ্রলোক ভারী মুশকিলে পড়েছেন। না

পারছেন থাকতে, না পারছেন বিক্রি করতে। যে-বাড়িতে পাঞ্জা ভূতের উৎপাত সে-বাড়ি কে কিনবে বলুন ! শেষ পর্যন্ত অক্ষয়বাবু বীতশ্রদ্ধ হয়ে বাড়িটার চাবি আমার জিম্মায় দিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, কারও যদি ভূত দেখার শখ হয় তাঁকে দেবেন।"

এখানে আসার আগে রজনীবাবুর মনে খানিকটা সন্দেহ জেগেছিল। তিনি চুপিচুপি একদিন শেয়ালদা স্টেশনে গিয়ে খোঁজ নিয়ে এসেছিলেন সত্যিই নিমপাট্টা বলে কোনও জায়গা আছে কি না। সেখান থেকে বাসে চেপে পাহাড়গড় বলে কোনও জায়গায় যাওয়া যায় কি না। খবর নিয়ে জানলেন আকাল মল্লিকের কথা মিথ্যে নয়।

এখন তিনি বুঝতে পারছেন পাঞ্জা ভূতের কথাও মিথ্যে নয়। অবশ্য তাঁর মনে এখনও সন্দেহ উঁকি মারছে। কোনও দুষ্টু লোকের কাণ্ড নয়তো ? কেউ চুপিসাড়ে ঘরে ঢুকে তাঁর লেখার কাগজের ওপর হাতের পাঞ্জার হালকা ছাপ দিয়ে গেছে। হরি তো স্বীকার করেছে এতক্ষণ সে ঘুমোচ্ছিল। রজনীবাবু বাথরুমে ছিলেন। দরজা হাট করে খোলা ছিল। এখানে চোর-ডাকাতের কোনও ভয় নেই, তাই যখন-তখন দরজা দেওয়ার প্রশ্ন নেই।

রাত্রিবেলায় শুয়ে-শুয়ে রজনীবাবু আকাল মল্লিক পাহাড়গড়ের এই বাড়ি আর পাঞ্জা ভূতের কথা ভাবছিলেন। এই বাড়িটা পুরনো হয়েছে এবং দেখাশোনার অভাবে খানিকটা ভুতুড়ে বাড়ির চেহারা নিয়েছে। তবে এই বাড়িটাতে ইলেকট্রিকের ব্যবস্থা আছে। উঠোনে একটা ইঁদারা আছে। ফলে জলের সমস্যা নেই।

পাহাড়গড়ের এইদিকটা নির্জন। হরিকে নিয়ে এখানে এসে সদরের তালা খুলে রজনীবাবু ওপরের এই ঘরটি বাসযোগ্য করে নিয়েছেন। নীচের একটি ঘর পরিষ্কার করে হরি নিজের থাকার মতন ঠিক করে নিয়েছে। একতলার দালানের এককোণে রান্নার ব্যবস্থা করেছে।

কাল রজনীবাবুরা খুব ক্লান্ত ছিলেন। এক ঘুমে রাত কাবার হয়ে গিয়েছিল। আজ রাত ন'টা নাগাদ পাঞ্জা ভূতের পদার্পণ ঘটল। সে-ভূতের চেহারা দেখা যায়নি। কেবল পাঞ্জার ছাপ রেখে গেছে।

রজনীবাবু বিছানায় এপাশ-ওপাশ করছিলেন। ঘুম আসছিল না। ঘর অন্ধকার। পায়ের দিকের জানলাটা খোলা। রজনীবাবু বিছানা ছেড়ে উঠে জানলার সামনে দাঁড়ালেন। বাইরে অন্ধকার প্রান্তর। ক্ষীণ শশাঙ্ক। তাই চাঁদের আলো বড় কম। একদৃষ্টে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাকিয়ে থাকতে-থাকতে তাঁর মনে হল, বাইরে বেরোতে হবে। বাইরের প্রকৃতি তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

পাঞ্জাবির পকেটে একটা টর্চ নিয়ে বাইরে যাওয়ার জন্য পা বাড়ালেন। বাইরে এসে দেখলেন চাঁদের ফিকে আলোয় নিকষ কালো অন্ধকার খানিকটা পাতলা হয়েছে। টর্চ জ্বাললেন না। আস্তে-আস্তে হাঁটতে শুরু করলেন। ঠিক কোথায় যেতে চাইছেন সেটা রজনীবাবু নিজেই জানেন না।

হাঁটতে-হাঁটতে একজনের কথা ভাবছিলেন। মূর্তিমান আকালের মতন রোগা লোভী নিরন্ন একটি মানুষ তাঁর ভাবনা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। তখনই মনে হল পাঞ্জা ভূত-টুত সব মিথ্যে। তাঁর লেখার কাগজের ওপর যে হাতের ছাপটি ফুটে উঠেছে সেটা

ভূতের নয়, মানুষের।

হাতের রেখা দেখে পামিস্টরা মানুষের ভূত-ভবিষ্যৎ বলতে পারেন, গোয়েন্দা বিভাগের দক্ষ ব্যক্তি হাতের ছাপ দেখে অপরাধীকে শনাক্ত করেন, কিন্তু রজনীবাবু ওই ছাপের ভেতর একটি হাভাতে মানুষের ছবি দেখতে পাচ্ছেন। ওই হাত গৃহস্থের দরজায়-দরজায় ভিক্ষে করছে, "হা অন্ন। হা অন্ন।" সে হাত পেতে বলছে, "পেট জ্বলছে। আমাকে খেতে দাও।" এইসব ভাবতে-ভাবতে রজনীবাবুর মাথা ঝিমঝিম করে উঠল। দাঁড়িয়ে পড়লেন। এখান থেকে পেছন ফিরে বাড়িটা দেখতে পাচ্ছেন। ওই বাড়ির সদর দরজা হাট করে খোলা আছে। একতলার ঘরে হরি ঘুমোচ্ছে। রজনীবাবু আর এগোলেন না। বাড়ি ফিরে চললেন।

খোলা দরজা দিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে যে-দৃশ্য দেখলেন তাতে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। দালানে ইলেকট্রিকের আলো নেই। একটা টুলের ওপর এর মধ্যে একটা হ্যারিকেন জ্বেলে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর দালানের থামের সঙ্গে একটা লোককে পিছমোড়া করে বাঁধা হয়েছে। সম্ভবত হরির একটা ধুতি দিয়ে বাঁধা হয়েছে। আর হরি হাতে একটা খুন্তি নিয়ে লোকটার সামনে চোখ পাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

"এসব কী ব্যাপার হরি?"

হরি চমকে উঠে বলল, "এই মাঝরাতে দরজা খুলে আপনি কোথায় চলে গিয়েছিলেন? আর দেখুন এই লোকটা ভূত সেজে আমাকে ভয় দেখিয়ে চুরি করতে এসেছিল।"

রজনীবাবু আগে সদর দরজাটা বন্ধ করলেন। তারপর হরির দিকে তাকিয়ে বললেন, "লোকটার বাঁধন খুলে দে।"

বাঁধন খুলে দিতেই লোকটা ধপ করে মেঝের ওপর বসে পড়ল আর হাউহাউ করে কেঁদে উঠল।

পকেট থেকে টর্চ বের করে লোকটার ওপর আলো ফেলে রজনীবাবু শিউরে উঠলেন। এ যেন আর-একটা আকাল মল্লিক! রোগা ডিগডিগে হাড়সর্বস্ব চেহারা। ন্যাড়া মাথা। খালি গা। পরনে একটা ঢলঢলে ইজের। রজনীবাবু হরিকে বললেন, "যে-কাপড়টা দিয়ে ওকে বেঁধেছিলি সেটা ওর সামনে বিছিয়ে দে।" হরি কাপড়টা বিছিয়ে দিল। এবার রজনীবাবু লোকটাকে বললেন, "তোমার ডান হাতটা কাপড়ের ওপর চেপে ধরো।"

লোকটা ফ্যালফ্যাল করে রজনীবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। এখনও লোকটার চোখেমুখে অশ্রু লেগে আছে। হরিও কিছু বুঝতে পারছিল না। বাবু এসব কী করছেন। বাবুর বোধ হয় মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

এবার রজনীবাবু লোকটাকে খুব জোরে ধমক দিলেন, "আমি কী বললুম শুনতে পেলে না?"

এবার লোকটা ডান হাতটা কাপড়ের ওপর চেপে ধরল। এক মিনিট পরে লোকটাকে হাত ওঠাতে বলে রজনীবাবু হরিকে বললেন কাপড়টা তাঁর সামনে মেলে ধরতে। হরি নিচু হয়ে কাপড়টা তুলে রজনীবাবুর সামনে মেলে ধরল। রজনীবাবু কাপড়ের ওপর টর্চর আলো ফেললেন। সাদা কাপড়ের ওপর হাতের পাঞ্জার ছাপ।

"পাঞ্জা ভূত।" বলে রজনীবাবু হো-হো করে হেসে উঠলেন।

কলকাতায় ফিরে রজনীবাবুকে ভারী অস্থির মনে হল। অস্থির হওয়ারই কথা। তাঁর যে এক্ষুনি আকাল মল্লিককে চাই। কিন্তু ওই লোকটির ঠিকানা তিনি জানেন না। এমনকী ভদ্রলোক যে কোথায় চাকরি করেন সেটাও তাঁর জানা নেই।

পাহাড়গড় থেকে রজনীবাবুর এত তাড়াতাড়ি ফেরার কথা নয়। সেখানে এক হপ্তা থাকবেন এমন কথা ছিল। এক হপ্তা পরে আকাল মল্লিকের আসার কথা। তার মানে এখনও তিনদিন বাকি। কিন্তু তিনদিন যে বড় দীর্ঘ। রজনীবাবু বালকের মতন অস্থির হয়ে উঠেছেন। আকাল মল্লিক যদি ভুল করে চলে আসেন, বড় ভাল হয়। এক হপ্তা মানে ঠিক কাঁটায়-কাঁটায় সাতদিন? কেউ যদি সাতদিনের জন্য বাইরে বেড়াতে যায়, তা হলে মেপে-মেপে সাতদিনই কি তাকে বাইরে থাকতে হবে? কমবেশি কি হয় না? জায়গাটা যদি ভাল না লাগে। যদি শরীর খারাপ হয়। তা হলে সাতদিনের জায়গায় তিন বা চারদিনও তো হতে পারে।

রজনীবাবু জানেন, তিনি মনে-মনে কখনও-কখনও এমন কিছু ভেবে নেন যা সত্যি হয়। তিনি যেন মনের চোখ দিয়ে অনেক সময় ভবিষ্যৎ দেখতে পান। যেমন এবারের ঘটনার কথা যদি ভাবা যায়। পাহাড়গড়ে পা দিয়ে একদিন বাদেই বুঝতে পেরেছিলেন পাঞ্জা ভূতটা আর কিছু নয়, এক হা-অন্ন মানুষের ভূত। অনাহার, দারিদ্র্য মানুষের মনুষ্যত্ব কেড়ে নেয়। মানুষ তখন ভূত হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত সেটাই কি ঘটেনি? সেদিন হাতে ভুসো মেখে যে-লোকটা পাঞ্জা ভূত সেজে পাহাড়গড়ের বাড়িতে ঢুকেছিল তার নাম বগা। বগা সবকিছু পেটের দায়ে করেছে।

হরি বাজারে গেছে। রজনীবাবু নিজের ঘরের টেবিলে চুপ করে বসে এইসব কথা ভাবছিলেন। হঠাৎ কী ভেবে টেবিল ছেড়ে উঠে পড়লেন। সদর দরজা খুলে একেবারে রাস্তায় নেমে গেলেন। রাস্তার ওপর চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর মন বলছিল এক্ষুনি আকাল মল্লিক আসবেন।

পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করার পর রজনীবাবু দেখলেন দূর থেকে পা ফেলে-ফেলে রোগা ডিগডিগে আকাল মল্লিক তাঁর বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছেন।

রজনীবাবু আকাল মল্লিককে নিয়ে সোজা নিজের ঘরে চলে এলেন। দু'জন মুখোমুখি দুটি চেয়ারে বসলেন। মাঝখানে টেবিল।

রজনীবাবু বললেন, "আজ আমার এখানে দুটি ভাত খেয়ে যাবেন।"

আকাল মল্লিক বললেন, "আপনি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন?"

"কেন। ঠাট্টা করব কেন?" রজনীবাবুর কথা শুনে আকাল মল্লিক মাথা নিচু করে বসে রইলেন। তারপর ধীরে-ধীরে বললেন, "আমাকে নিশ্চয়ই ঠগ-জোচ্চোর ভাবছেন। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি আপনাকে ভাঁওতা দিতে চাইনি। আমি চেয়েছিলুম আপনি একবার পাহাড়গড়ে যান। সব দেখে আসুন। জেনে আসুন জ্যান্ত মানুষও না খেতে পেয়ে কেমন ভূত হয়ে যায়। তারপর তাদের নিয়ে গল্প লিখুন।"

রজনীবাবু নড়ে-চড়ে বসলেন। অতঃপর শান্তস্বরে বললেন, "আপনার সব কথা শুনতে চাই। তারপর দেখব গল্প লেখা যায় কি না।"

এই কথা শুনে আকাল মল্লিক উৎসাহে লাফিয়ে উঠলেন, "সত্যি আপনি শুনবেন? জানতুম শুনবেন। দুঃখীর দুঃখে আপনার প্রাণ কাঁদে জানি। তাই তো আপনার কাছে ছুটে এসেছি। আমার নাম আকাল নয়। আসল নাম বিভূতি মল্লিক। বিয়ে-থা করিনি। বিধবা মাকে নিয়ে চেতলার বস্তিতে থাকি। কাজ করতুম শ্রীরামপুরের জুট মিলে। তিন বছর হল মিলে লক আউট। ক্লাস এইট পর্যন্ত বিদ্যে। কারখানায় হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে শরীর-স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে গেছে। এখন দু'বেলা পেট পুরে খেতে পাই না। তবে ভগবান আমাকে যেমন দারিদ্র্য দিয়েছেন, অভাব দিয়েছেন, অস্বাস্থ্য দিয়েছেন, তেমনই দিয়েছেন খানিকটা কল্পনাশক্তি, খানিকটা কুশলীবুদ্ধি। লেখার ক্ষমতা দেননি। যদি দিতেন তা হলে···, যাকগে ওসব কথা।" আকাল ওরফে বিভূতি এবার থামলেন। একটানা কথা বলে হাঁপিয়ে পড়েছেন। দম নিয়ে আবার কথা শুরু করলেন, "পাহাড়গড়ের ওই বাড়িটা অক্ষয়বাবুর। আমাদের মিলের চিফ ক্যাশিয়ার ছিলেন অক্ষয়বাবু। এখন বাতে পঙ্গু। পাহাড়গড় জায়গাটা এমন কিছু আহামরি নয় যে ট্যুরিস্টরা বেড়াতে যাবেন। অক্ষয়বাবু বাতে পঙ্গু, তার ওপর সংসারে তো তাঁর আপন বলতে আর কেউ নেই। বাড়িটা দেখাশোনা করবে কে? অক্ষয়বাবু বলেছিলেন, 'বিভূতি, তুমি বরং পাহাড়গড়ে চলে যাও। মাকে নিয়ে ওখানে থাকো।' তা কেমন করে সম্ভব? ওখানে গেলে পেট চলবে কেমন করে? চাকরি তো হাতের মোয়া নয়! মাঝে-মাঝে পাহাড়গড়ে যাই। অক্ষয়বাবু অবশ্য খরচ-টরচ দেন। দেখে-টেখে আসি। খদ্দের খুঁজি। কিন্তু অমন জায়গায় ওই বাড়ি কে কিনবে? বগা ওই বাড়ির কাছাকাছি থাকে। আমারই মতন হাড়-জিরজিরে চেহারা। তার দশা আমার চেয়েও খারাপ। আমি তো তবু বিয়ে-থা করিনি। সে বেচারা আবার বিয়ে করেছে। তিনটি ছেলেমেয়ে। নিজের জমি-জায়গা নেই। পরের জমিতে খাটে। তাতে পাঁচটি মানুষের পেট ভরে না।

"শেষ পর্যন্ত মনে-মনে একটা মতলব ভাঁজলুম। এবার পাঞ্জা ভূতের লীলা খেলা দেখিয়ে আপনাকে চমকে দেব। আপনাকে পাহাড়গড়ে পাঠাব। পাঞ্জা ভূত হবে বগা। সেখান থেকে ফিরে আপনি একটা জব্বর গল্প লিখবেন। আর তারপর আপনি কি এই গরিব মল্লিককে খুশি করবেন না? খবর নিয়ে জেনেছি আপনি মশাই দাতাকর্ণ। গরিব দুঃখীর দুঃখে আপনার চোখে জল আসে। প্রথমে অবশ্য ভেবেছিলুম সরাসরি আপনার কাছে নিজের দুর্দশার কথা বলে সাহায্য চাইব। কিংবা আপনি এত বিখ্যাত লেখক, কত চেনাজানা আপনার, আপনি কি আমার একটা কাজকর্ম জুটিয়ে দিতে পারেন না? ওইসব ছলনা মতলবে কী দরকার। কিন্তু মাথায় আমার পোকা আছে রজনীবাবু। সেই পোকাটা আমাকে সুস্থির থাকতে দিল না। আবার আমার পাহাড়গড়ে যাওয়ার কথা হল। সেখানে যাওয়ার আগে আপনার সঙ্গে আলাপ করে গেলুম। তারপর পাহাড়গড়ে গিয়ে বগার সঙ্গে কথা বলে এলুম। কীভাবে তাকে পাঞ্জা ভূত হতে হবে শিখিয়ে দিলুম।" একটানা কথা বলে বিভূতি মল্লিক এবার থামলেন।

রজনীবাবু এতক্ষণ শান্তভাবে বসে মল্লিকের কথা শুনছিলেন। এবার গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বসে বললেন, "আশ্চর্য! বগাটা কিছুতেই স্বীকার করল না আপনি তাকে এসব শিখিয়ে-পড়িয়ে দিয়েছেন। কোনও কথার উত্তর দেয়নি। শুধু নিজের পেটটা দেখিয়ে কেঁদেছে আর বলেছে, সবই বাবু পেটের জন্য।"

মল্লিক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, "হ্যাঁ রজনীবাবু, সবই এই পেটের জন্য। নইলে জ্যান্ত মানুষ কী আর ভূত হয়?"

রজনীবাবু কোনও কথা বললেন না। তিনি একদৃষ্টে মূর্তিমান আকালের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ছবি : দেবাশিস দেব

আঁকিবুকি — রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঘের মাসি

গত সংখ্যায় আঁকার পাতায় ছিল একটি বিড়ালের মুখের কল্পনা। এবারে দ্যাখো, সেই বিড়ালের মুখটি পরিপূর্ণভাবে ফুটে উঠেছে। এই 'বাঘের মাসি'কে দেখতে কিন্তু বেশ লাগছে।

হাসিখুশি — শতদল

মা বললেন, "তোমাকে কতবার বলেছি সবসময় তোয়ালেটা ব্যবহার করবে। দরকারের সময় কখনওই ওটা পাওয়া যায় না।"
সমু বলল, "আমি সবসময়ই তো এটা ব্যবহার করি না। এইমাত্র পুষি বেড়ালের লেজটা তোয়ালে দিয়ে চেয়ারের পায়ার সঙ্গে বেঁধে রাখলাম।"

রিন্টু বলল, "বাবা, টুকাই না একটা নতুন সাইকেল কিনেছে।"
বাবা বললেন, "সেকী, তার যে একটা লাল রঙের সাইকেল ছিল,

সেটা কী হল?"
রিন্টু বলল, "তুমি টাকা দিলেই টুকাই ওটা আমাকে বিক্রি করে দেবে।"

ক্যাম্পাস

অভিনয় শিক্ষার স্কুল

কলকাতার ইনস্টিটিউট অব ফিল্ম অ্যান্ড অ্যালায়েড আর্টস (IFAA) পূর্ব ভারতের প্রথম অভিনয় শেখার স্কুল। বর্তমানে 'ইফা' অভিনয়, নির্দেশনা, সঙ্গীত, নৃত্য, মূকাভিনয় ও আবৃত্তি শেখার ব্যবস্থা করেছে।

ইফার সার্টিফিকেট কোর্সগুলি সাধারণত দু' বছরের। প্রথম বছর শিক্ষার্থীরা পায় বিভিন্ন বিভাগে প্রাথমিক জ্ঞান, পরের বছর তারই ভিত্তিতে ওয়ার্কশপের মধ্যে দিয়ে মূল্যায়ন করা হয়। এইসঙ্গে আছে অন্য পরীক্ষাও। যেমন ফিজিক্যাল ট্রেনিং এবং ক্যামেরা, মাইক্রোফোনের সামনেও পরীক্ষা দিতে হয়। ক্লাস-টেস্ট ছাড়াও বছরে চারটি পরীক্ষা।

এই দু' বছরে ফলিতকলার কতটুকুই বা রপ্ত করা যায়, এই প্রশ্নের উত্তরে অধ্যক্ষ দিলীপ রায় বলেন, "ইফার মূল উদ্দেশ্য হল ফলিতকলায় ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষিত করে তোলা। তার জন্য দু' বছর কিছুটা কম সময় বটে, কিন্তু এই দু'বছরে শিক্ষার্থীরা যা শিখবে, সেটুকুই জানতে আমাদের সময় লেগেছিল এক যুগ।" ইফার উদ্দেশ্যই তাই। কম সময়ে একঝাঁক অভিনেতা-অভিনেত্রী, কলাকুশলী তৈরি করা। এই আশা নিয়ে দিলীপ রায় এই প্রতিষ্ঠানের কাজ শুরু করেন ১৯৮৮ সালের ১৭ নভেম্বর।

বর্তমানে ইফায় শিক্ষক হিসেবে আছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়, অশোক মুখোপাধ্যায়, বিভাস চক্রবর্তী, অসিত মুখোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ বণিক, ডঃ বিষ্ণু বসু, ডঃ পবিত্র সরকার, অঞ্জন দেব, গৌতম চক্রবর্তী, মনোজ মিত্র, বিজন চৌধুরী, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, দেবাশিস দাশগুপ্ত, ভি বালসারা, জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, গোবিন্দন কুট্টি, থানকোমনি কুট্টি, অশোক বিশ্বনাথন, গৌতম ঘোষ ও দিলীপ রায় প্রমুখ।

নন্দনে অভিনয়ের ক্লাস নিচ্ছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

ইফাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে পশ্চিমবঙ্গ তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ। নন্দন, অহীন্দ্র মঞ্চ ও সল্ট লেকের রূপায়ণ-এ ইফার বিভিন্ন ছবির প্রদর্শন, অনুষ্ঠান ও টেকনিক্যাল কাজ হচ্ছে।

ইনস্টিটিউটের মধ্যেও চলছে বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষা, ডিরেক্টর ফ্যাকাল্টিরা অ্যাকটিং ফ্যাকাল্টিদের নিয়ে করছেন ছোট-ছোট ছবি, অনুষ্ঠান হচ্ছে নৃত্য, মাইম, আবৃত্তি, সঙ্গীত বিভাগে।

এ-বছর নভেম্বরে শুরু হচ্ছে ইফা'র ছোটদের বিভাগ। এই বিভাগটিকে দু' ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ৬ থেকে ১১ এবং ১২ থেকে ১৫ বছর অবধি। দু' বছরের কোর্স। প্রথম বছর বিভিন্ন আঙ্গিকের প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হয়। পরের বছর নাটকের পরীক্ষা। অধ্যক্ষ দিলীপরায় জানান, "আমাদের দেশে ছোটদের কথা ভাবা হয় কম, তাই ছোটদের কথা ভেবেই এই বিভাগের ব্যবস্থা করা হয়েছে।"

ইফা'র তত্ত্বাবধায়ক জয়ন্তী সেনগুপ্ত বললেন, "ছোটদের এই বিভাগটি সৃষ্টির পেছনে আছে অভিভাবকরাই, তাঁদের উৎসাহেই বিভাগটি তৈরি করা হয়েছে।"

স্বপ্নাতীত সরকার

সুন্দর অভিনয়

ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট মঞ্চে ১৬ জুলাই সন্ধেবেলা রঙের হাট বসেছিল। নাচ, গান, ঝকমকে পোশাকের সঙ্গে ছিল রঙিন আলোর খেলা। সুন্দর মঞ্চসজ্জা, সব মিলিয়ে একেবারে রঙে-রঙে ছয়লাপ। সঙ্গে ছোট্ট শিল্পীদের মনকাড়া অভিনয়।

'নবচেতনা' সংস্থার শিশুশিল্পীরা দারুণ জমকালো আলিবাবা নাটক দিয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করে রেখেছিল। চার থেকে বারো বছর বয়সের বিভিন্ন স্কুলের সাতাশজন ছেলেমেয়ে নাটকে অংশ নিয়েছিল।

দেড় ঘন্টার নাটকে ছিল চোদ্দটি নাচ ও গান। প্রত্যেকটি দৃশ্যের পরে দর্শকরা সহর্ষ হাততালি দিয়ে খুদে অভিনেতাদের অভিনন্দিত করেছেন। মর্জিনার ভূমিকায় অভিনয় করে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী মধুপর্ণা সেন বরাট বিচারকদের সিদ্ধান্তে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছে। শুধু সে নয়, প্রতিটি শিল্পীই দুর্দান্ত অভিনয় করেছে। তাদের মধ্যে আলাদা করে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছে আলিবাবা চরিত্রে সুদীপ্ত দাস, আবদাল্লা চরিত্রে সোমনাথ দত্ত। দারুণ এই নাটকটির নির্দেশনার দায়িত্বে ছিল কিশোর-নির্দেশক কিঞ্জল ভট্টাচার্য। নবচেতনা তাদের এই সুন্দর প্রযোজনাটি দূরদর্শনের পরদায় করার উদ্যোগ নিচ্ছে।

অঞ্জন সিকদার

(শেষাংশ)

সম্পূর্ণ উপন্যাস

ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা

সমরজিৎ কর

বিকেলের দিকে আবহাওয়া খুব ভ্যাপসা ছিল। রাতের দিকে আবহাওয়ার তাপমাত্রা হঠাৎ কমে যাওয়ায় বেশ ভাল লাগল। অস্টিনে এরকম হয়। বিশেষ করে গ্রীষ্মেও। মেক্সিকো উপসাগরে নিম্নচাপ দেখা দিলে ঘটে ঝড়-বৃষ্টি। অস্টিনের দক্ষিণে। তারপর ঝিরঝির বৃষ্টি। বৃষ্টির পর বাতাসের তাপমাত্রা নেমে যায়। এতক্ষণ ঘরের ভেতর শীতাতপের মধ্যে ছিলাম। কিছুই বুঝতে পারিনি। বাইরে বেরোতেই দেখলাম বৃষ্টি হয়েছে।

টেকসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে পৌঁছে "ওকে ডঃ বাসু, গুড লাক। আপনারা এগোন। নতুন কিছু নজরে পড়লে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব." বলেই অধ্যাপক অ্যান্টোনিয়েভিচ বাঁ দিকে ফিজিক্স বিল্ডিং-এর উদ্দেশ্যে পা বাড়ালেন।

"দ্যাটস রাইট।" বললেন ডঃ বাসু। তাঁকে খুব আত্মমগ্ন মনে হল।

মলিকিউলার বায়োলজি বিল্ডিং ফিজিক্স বিল্ডিংয়ের কাছেই। সেই

বিল্ডিংয়ের বেসমেন্টের একটি ঘরে গিয়ে আমরা হাজির হলাম।

যেতেই দেখলাম, একটি ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের সামনে জন-তিনেক গবেষক নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে।

"নতুন কোনও খবর, বব ?" ঘরে ঢুকেই তাদের একজনের উদ্দেশে কথা বললেন ডঃ পেরালেজ।

"ইয়েস, সার। কোয়ায়েট সারপ্রাইজিং।" ডঃ পেরালেজের কথা শোনামাত্র ত্বরিৎগতিতে এগিয়ে এল সে— মানে বব।

"রবার্ট ক্লাওফার্ড।" বললেন ডঃ পেরালেজ।

"হাউ ডু ইউ ডু ?" এগিয়ে এসে তার সঙ্গে করমর্দন করলেন ডঃ বাসু। "আমার নাম ডঃ বাসু।" বললেন তিনি।

"কোষগুলি প্রচণ্ডভাবে বিভাজিত হচ্ছে, আগের চেয়েও বেশি।" বলল বব। বছর তিরিশ বয়েস। উত্তেজনায় কাঁপছে।

"ডঃ রাজাগোপাল, ব্যাপারটা আপনি দেখুন তো ?" বলেই ডঃ পেরালেজ এগিয়ে গেলেন ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের দিকে।

মাইক্রোস্কোপটির পাশেই মাইক্রোপ্রসেসর। তার পরদা ততক্ষণে আলোকিত হয়ে উঠেছে। মাইক্রোস্কোপের ছবি ভেসে উঠছে পরদায়।

মাইক্রোস্কোপের সামনে বসে একের-পর-এক বোতাম টিপতে লাগল রাজা। আর আমরা দলবদ্ধভাবে তার পেছনে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

"এক মিনিট। তরপর কী ব্যাপার ? এ তো কিলার, সার ?" বলল রাজা। তার সারা মুখে দেখা দিল আতঙ্ক।

"জানি। কিন্তু আগে ওরা কিলার ছিল না।" মন্তব্য করলেন ডঃ পেরালেজ। "বব, গোড়া থেকে এ পর্যন্ত যা ঘটছে সেটা দেখাও দেখি। তা হলেই পুরো ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে।"

তাঁর কথামতো রবার্ট ভি·সি·আর চালু করল। আর সঙ্গে-সঙ্গে টেলিভিশনের পরদায় ফুটে উঠল একের-পর-এক ছবি।

প্রথমে এক ধরনের ছত্রাক। এক-একটির আয়তন ফুলের রেণুর চেয়েও বহুগুণ ছোট। লালচে রং। দ্বিতীয় ছবিতে দেখা গেল ছত্রাকগুলি একটি টেস্ট টিউবে রাখা হয়েছে।

"টেস্ট টিউবে একটি তরল পদার্থ দেখছি ?" রাজার কণ্ঠে জিজ্ঞাসা।

"ওটা জল।" বললেন ডঃ পেরালেজ, "জলে সামান্য গ্লুকোজও রয়েছে।"

তৃতীয় ছবি। টেস্ট টিউবটি ছত্রাকসহ একটি উন্মুক্ত জায়গায় রাখা হয়েছে। জানালার পাশে। সূর্যের আলো এসে পড়েছে তার ওপর।

চতুর্থ ছবি। ছত্রাকগুলির রং পালটাচ্ছে। লাল থেকে ধূসর। তারপর ফিকে হলুদ। অবশেষে ফিকে সবুজ।

"আশ্চর্য ! একই কাণ্ড ভিক্টোরিয়া ল্যান্ডেও তো দেখেছি। তবে সেটা ছিল এক ধরনের শৈবালের ব্যাপার।" বলেই আমার দিকে তাকাল রাজা।

"সেই কারণেই তো আপনাকে স্মরণ করেছি, ডঃ রাজাগোপাল। আপনার পরীক্ষার বিবরণটি আমরা পড়েছি। তাই ছত্রাকের এই ঘটনাটি চোখে পড়তেই প্রথমে আপনার কথাই আমার মনে পড়ে।" বললেন ডঃ পেরালেজ।

"তুমি কি মনে করো, এ-ক্ষেত্রেও সেই সৌর-ঝড় কাজ করেছে ?" এতক্ষণ নিশ্চুপ পাথরের মতোই দাঁড়িয়ে সব কিছু লক্ষ করছিলেন ডঃ বাসু। এবার মুখ খুললেন তিনি।

"আমার তা মনে হয় না। কারণ ভিক্টোরিয়া ল্যান্ডে যে শৈবাল নিয়ে পরীক্ষা চালিয়েছিলাম, সেগুলি ছিল এক-কোষী। কিন্তু ডঃ পেরালেজ ছত্রাক নিয়ে পরীক্ষা করেছেন। সৌর-ঝড়ের কণায় এত শক্তি নেই যে, তা তাদের জৈবিক অণুকে প্রভাবিত করতে পারে ?"

"সমীর, তোমার কী মনে হয় ?" এবার আমাকেই প্রশ্ন করে বসলেন ডঃ বাসু।

"এলাইজা গামা বিকিরণের কথা বলছিল, ডঃ বাসু। কেন জানি না, ওই মুহূর্তে এলাইজার কথাটাই মনে পড়ল আমার।"

"গামা বিকিরণ !" বলেই থেমে পড়লেন ডঃ বাসু। গবেষণাগারের

ক্ষীণ আলোতেও পরিষ্কার দেখতে পেলাম, মুহূর্তে তাঁর সারা মুখে ফুটে উঠল প্রচণ্ড হতাশার চিহ্ন।

"তা হলে, শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়িয়েছিল ডঃ পেরালেজ ?" প্রশ্ন করল রাজা। বুঝতে পারলাম, সে খেই হারাতে চায় না।

তার প্রশ্নে ডঃ পেরালেজ যা বললেন, সেটা সংক্ষেপে এইরকম : "একটি হ্রদের শৈবাল নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে এই ছত্রাকের সন্ধান পায় তাঁরই এক ছাত্র। সেই ছাত্রই ছত্রাকগুলি শৈবালের গা থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে আসে। পরে দেখা যায়, গ্লুকোজের হালকা দ্রবণে রাখলে তারা দ্রুত বিভাজিত হয়। আর সেই সময় তাদের থেকে বেরোতে থাকে নানারকম এন্‌জাইম। সেই এন্‌জাইমের মধ্যে একটিকে দেখা গেল ক্যান্সার-কোষ ধ্বংসের ব্যাপারে খুবই সক্রিয়। মজার ব্যাপার কি জানেন, ডঃ বাসু ? সূর্যের আলোর স্পর্শ পেলে তবেই ওই ছত্রাকগুলিতে এই বিচিত্র এন্‌জাইম তৈরি হয়।"

"আপনার বিবরণের সঙ্গে দেখছি আমার অভিজ্ঞতাও মিলে যাচ্ছে।" বলল রাজা, "সূর্যের আলোর স্পর্শে, বরং বলি, জানেন তো, কুমেরু অঞ্চলে নানারকম পারমাণবিক কণার ভীড় ? কুমেরু অঞ্চলে চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে পড়ে প্রাথমিক মহাজাগতিক কণাগুলি ভেঙে গিয়ে সৃষ্টি করে নানারকম পারমাণবিক কণা। সেই কণার প্রভাবে ওই শৈবালের মধ্যে তৈরি হয় এক ধরনের এন্‌জাইম। সেই এন্‌জাইমগুলি সেখানকার জলের ক্ষতিকর ব্যাকটিরিয়াদের হত্যা করে তাদের আত্মরক্ষায় সাহায্য করে। সেই এন্‌জাইম খুবই বিষাক্ত, ডঃ পেরালেজ।"

"এ ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা সেইরকমই ঘটে। ছবিতে দেখলেন তো ! তবে প্রথম দিকে এই ছত্রাক যে এন্‌জাইমটি তৈরি করে সেটি বিষ ঠিকই। তবে একমাত্র ক্যান্সার-কোষ ছাড়া তা আর কারও ক্ষতি করেনি।" বললেন ডঃ পেরালেজ।

"তা হলে ?"

"এই তা হলেই তো বড় কথা, ডঃ রাজাগোপাল।" ডঃ পেরালেজের কণ্ঠে এবার উত্তেজনা, "কয়েকদিন আগে বেশ কয়েকটি টেস্টটিউবের মধ্যে ওই ছত্রাক নিয়ে আমরা পরীক্ষা চালাচ্ছিলাম। আগের মতোই সেগুলি জানালার পাশে রেখে দেওয়া হয়। যে এন্‌জাইমটি টকসিন বা বিষ হিসেবে কাজ করছিল, পাশের ঘরে আমার সহকারীদের নিয়ে তার রাসায়নিক গুণাগুণ পরীক্ষা করে দেখছিলাম। হঠাৎ একসময় রবার্ট এসে হাজির। তাকে বেশ উত্তেজিত দেখাচ্ছিল।"

"সার, টেস্টটিউবগুলিতে একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটছে। আপনি এক্ষুণি দেখবেন, চলুন।" সে বলল।

"কী ব্যাপার ?" জিজ্ঞেস করলাম আমি।

"একটি নতুন প্রজাতি জন্ম নিচ্ছে !"

"তার মানে ?"

"আমি প্রায় দৌড়েই গেলাম সেই টেস্টটিউবগুলি দেখতে। আর, হায় ভগবান ! এ আমি কী দেখছি। কোথায় সেই লাল ছত্রাক। টেস্টটিউবগুলির মধ্যে রাখা ছত্রাকগুলির রং ফিকে সবুজ—লালের কোনও চিহ্নও নেই। এটাও দেখলাম, সেই সবুজ ছত্রাক দ্রুত বংশবৃদ্ধি করছে।"

"তারপর ?" প্রশ্ন করল রাজা।

"তারপর আর কী ? সত্যিই নতুন প্রজাতির ছত্রাক জন্ম নিয়েছে।" বললেন ডঃ পেরালেজ।

"তার মানে বলতে চান ব্যাপারটা মিউটেশন। অর্থাৎ এক প্রজাতির ছত্রাক পালটে গিয়ে ভিন্ন প্রজাতিতে পরিণত হয়েছে।"

"ঠিক তাই। তবে এ ক্ষেত্রে দুটি আশ্চর্য ঘটনা আমরা লক্ষ করেছি। কয়েক প্রজন্মের পর সেই নতুন প্রজাতির ছত্রাক আবার তার পূর্ব অবস্থায় ফিরে আসে। আর, সেই সময় তা তৈরি করে আর-এক ধরনের বিষাক্ত এন্‌জাইম। যার নাম দিয়েছি আমরা

'এক্স' । দেখা গেল, প্রাণিদেহের ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত বিষাক্ত । ইঁদুর, খরগোশ এবং বানরের ওপর প্রয়োগ করলে তারা দ্রুত অসুস্থ হয় । তাদের মধ্যে দেখা দেয় নানারকম রোগ । ডঃ বাসু, আপনি ডঃ বার্নস্টাইনকে চেনেন তো ! আমাদের এই পরীক্ষার কথা কীভাবে তিনি জানতে পান । তিনি এসে বলেন, ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং । নতুন প্রজন্মের ছত্রাকের কিছুটা নমুনা চাইলেন । ভাবলাম, এনজাইম রসায়নে তিনি তো পণ্ডিত । দিয়ে দিই । তিনিও পরীক্ষা করে দেখুন রহস্য কোথায় ?"

"খুব ভাল, মৃত্যুবাণটা তা হলে নিজের হাতেই তুলে দিলেন বার্নস্টাইনকে ?" এবার ডঃ বাসু ক্ষোভে ফেটে পড়লেন যেন ।

"কেন বলুন তো ?"

"থাক । সে-কথা পরে হবে ।" বলেই হঠাৎ ইতি টানলেন ডঃ বাসু । তিনি বুঝতে পারলেন, বার্নস্টাইনের এখনকার পরিচয় ডঃ পেরালেজ জানেন না বলেই অমন সরল মনে নতুন ছত্রাকের নমুনাটি তাঁর হাতে তুলে দিয়েছেন তিনি । আপাতত তাঁর ব্যাপারটা তিনি ভাঙতেও চাইলেন না ।

সারারাত ধরে সেই এনজাইম এক্স এবং সবুজ ছত্রাক নিয়ে আমরা নানারকম পরীক্ষা চালালাম । জিম কম্পিউটারের সাহায্যে এনজাইমটির রাসায়নিক গঠনও জেনে নিল । জানা গেল এটি এক ধরনের প্রোটিন যৌগ । শরীরে প্রবেশ করলেই পাকস্থলীর পরিপাক ব্যবস্থায় আনে বিপর্যয় । সেইসঙ্গে মস্তিষ্কের স্নায়ুমণ্ডলকে অসাড় করে ।

পরদিন ঠিক হল, রাজাগোপাল এবং জিমের তত্ত্বাবধানে এই পরীক্ষাগুলি চলুক । অন্তত আরও পাঁচদিন । আর সেই ফাঁকে ডঃ বাসু, ডঃ পেরালেজ, অধ্যাপক অ্যান্টোনিয়েভিচকে এবং আমাকে নিয়ে একটু বাইরে যাবেন । কোথায় ? সে-কথা ডঃ বাসু অবশ্য ভাঙলেন না ।

॥ ৫ ॥

ডঃ বাসুর চরিত্রের সবচেয়ে বড় দিক, যে-কোনও জটিল ঘটনাই তিনি যেন অনেক আগ বাড়িয়ে দেখতে পান । তা ছাড়া তাঁর পরিচয়ের গণ্ডিটাও এতবড় যে, অনেক সময় কারও-কারও কাছ থেকে অনেক জটিল সমস্যার সূত্র কেন জানি না তাঁর পেতে অসুবিধে হয় না । তবে ঝামেলাও রয়েছে । মাঝে-মাঝে তিনি শামুকের মতো এমন মুখ বন্ধ করেন, বড় অস্বস্তিতে পড়তে হয় । আর সে-সময় তাঁর ব্যবহার দাঁড়ায় হিটলারের মতো, "যা বলছি করো, প্রশ্ন করবে না—" কতকটা এইরকম । বলতে কি, এ ক্ষেত্রে তেমনটিই ঘটল শেষ পর্যন্ত ।

বললেন, বাইরে যাবেন । কিন্তু সেটা যে বিরাট একটি চক্কর সেটা কি বুঝতে পেরেছিলাম ?

আমরা চারজন । ডঃ বাসু, ডঃ পেরালেজ, অধ্যাপক অ্যান্টোনিয়েভিচ এবং আমি । আমরা সত্যি-সত্যিই গোয়েন্দাগিরি করতে বেরোলাম । এর আগেও এমন ঘটনা ঘটেছে । এ ক্ষেত্রে তিনি যা বলেন, শুনতে হয় ; যা করতে বলেন, করতে হয় ; প্রশ্ন করলে তবেই জবাব দিতে হয়, আগ বাড়িয়ে কোনও কথা নয় । তাঁর প্রতিটি কাজ একেবারে ছকে বাঁধা থাকে । অতএব !···

সেদিন বিকেলের বিমানে লসঅ্যাঞ্জেলিস । সেখানে গিয়ে সান্তামানাকায় একটি ছোট্ট হোটেলে উঠলাম । জায়গাটা বেভারলি হিলসের নীচে । একেবারে প্রশান্ত মহাসাগরের বেলাভূমির পাশে । ছোট্ট হোটেল । মালিক এক মেক্সিকান মহিলা । নাম আঞ্জেলা আমেরিকা । বছর ষাটেক বয়েস । দেখলাম, এখানে ট্যুরিস্টদেরই ভিড় । বুঝলাম, ডঃ বাসু আমাদের নিয়ে ট্যুরিস্টদের মধ্যে মিশে থাকতে চান ।

পরদিন ব্রেকফাস্টের পর আমাদের সেখানে রেখে বেরিয়ে গেলেন তিনি । বলে গেলেন, ফিরতে দেরি হবে । সন্ধে হতে পারে । এবং

এক বৎসর

২৬ সংখ্যার জন্য ১৮২ টাকার বদলে
এখন দিতে হবে মাত্র ১৫৫ টাকা

দুই বৎসর

৫২ সংখ্যার জন্য ৩৬৪ টাকার বদলে
এখন দিতে হবে মাত্র ৩০০ টাকা

বিদেশের গ্রাহক

বার্ষিক ২৬ সংখ্যার জন্য
৩৬ ডলার অথবা ২২ পাউন্ড

আপনি যদি গ্রাহক হতে চান তাহলে অনুগ্রহ করে আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকানা অবিলম্বে আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের অনুকূলে চেক অথবা ড্রাফট সহ নীচের ঠিকানায় পাঠান :

সারকুলেশন ম্যানেজার (ইউ)
আনন্দ বাজার পত্রিকা লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট কলিকাতা-৭০০ ০০১

কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রযোজ্য নয়

CLARION C-ABAMD-1

এ-সময় হোটেল ছেড়ে যেন আমরা বাইরে না বেরোই। কথাটা যে বার্নস্টাইনের শাগরেদদের কথা ভেবেই বললেন, বুঝতে অসুবিধে হল না। কারণ ধুরন্ধর সেই মানুষটি যে আমাদের ওপর নজর রাখবেই। তাই নিরাপত্তার প্রয়োজনেই এই উপদেশ।

তাই সারাটাদিন প্রায় রুদ্ধদ্বারেই কাটল।

সন্ধে সাতটায় ফিরলেন ডঃ বাসু।

আমরা কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। কিন্তু ওই যে, আগ বাড়িয়ে কোনও প্রশ্ন চলবে না? তাই নিশ্চুপই রইলাম আমরা।

"আপনার অনুমানই ঠিক, পিটার। এলাইজা ঠিকই বলেছে, ব্যাপারটা গামা বিকিরণ। ভাবছি, যদি এই অবস্থাই হয়, তা হলে তো পৃথিবীর মানুষের বাঁচার কোনও আশাই নেই। আমরা কি শেষ পর্যন্ত আত্মঘাতী হব? পরিষ্কার! এখন আমার কাছে পরিষ্কার। বিচিত্র সেই ছত্রাকের সৃষ্টিগত পরিবর্তন ঘটিয়েছে গামা বিকিরণ। আর তার উৎস! আজ সারাদিন প্যাসাডিনায় ছিলাম। সেখানকার জেট প্রপালশন ল্যাবরেটরির প্রোগ্রাম বিভাগের প্রধান নিকোলাস আমার বন্ধু। তার সঙ্গে আজ সারাদিন ছিলাম। সে-ই আমাকে জানাল, স্কর্পিয়াকে আকাশে দেখা যাচ্ছে না। বেচারা সারাদিন প্রোগ্রাম মনিটার নিয়ে প্রচুর খেটেছে।" একনাগাড়ে বলে গেলেন ডঃ বাসু।

এবার মাথায় তালগোল পাকানোর অবস্থা হল আমার, "কী বলছেন ডঃ বাসু? কেমন যেন নাটকীয় লাগছে সব? স্কর্পিয়া! সে আবার কী?"

"থাক। ওসব কথা পরে হবে।" আবার শুরু করলেন ডঃ বাসু, "ডঃ পেরালেজ, আপনি বলছেন, বার্নস্টাইনকে আপনি সবুজ ছত্রাক-ভর্তি একটি টেস্টটিউব দিয়েছেন। তাই তো?"

"ঠিক তাই।" ডঃ পেরালেজের কণ্ঠে বিস্ময়।

"তা হলে কাল সকালেই আমরা পেরুর রাজধানী লিমায় যাচ্ছি। সকাল সাতটায় এয়ার মেক্সিকানার বিমান।" বলেই নিজের ঘরে চলে গেলেন ডঃ বাসু।

আমরা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলাম।

পরদিন হফিং ফ্লাইট। বিমানযাত্রীতে ঠাসা। সব দক্ষিণী মানুষ। কেউ যাবে পানামায়, কেউ মেক্সিকো। লিমার যাত্রীও অনেক। চিৎকার হইহুল্লোড় করতে লাতিন আমেরিকার মানুষ ওস্তাদ। প্রচণ্ড আবেগপ্রবণও। অতএব বিমানের খোল যেন সরগরম হয়ে দাঁড়িয়েছে। ডিসি-১০ বিমান। আমরা চারজন পাশাপাশি নিশ্চুপ বসে রইলাম।

বিমান তো নয়, যেন শহরতলির ট্রেন। সব স্টেশনেই থামছে। আর হইহুল্লোড় করে একদল যাত্রী উঠছে, আর-একদল নামছে। স্টপওভারও অনেক। মেক্সিকো সিটি, বোগোটা, ইকুয়াদোরের রাজধানী কুইটো, তারপর লিমা। প্রায় ছ' ঘণ্টা লাগল লিমায় পৌঁছতে।

কাস্টম ছেড়ে বাইরে বেরোতেই, "ওলা, ওলা, বাসু" বলতে-বলতে ছুটে এলেন এক ভদ্রলোক। ডঃ বাসুরই বয়েসী। ইংরেজি 'হ্যালো' শব্দটিকে স্প্যানিশ ভাষায় বলা হয় 'ওলা'। বুঝতে পারলাম, ভদ্রলোক স্প্যানিশ।

বেঁটেখাটো মানুষ। মাথার পুরোটাই টাক। বড়-বড় চোখ। অতবড় চোখ পুরুষের মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না। আর ডঃ বাসুকে সে কী আলিঙ্গন। প্রথম দর্শনেই মনে হল, দারুণ আবেগপ্রবণ মানুষ।

"ডক্টর দেমিনগে আভিদো।" বলেই ডঃ বাসু তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন আমাদের।

"বুয়েনস দিঅস, সিনোরস (শুভদিন, মশাইরা)। ওয়েলকাম টু লিমা।" আমাদের সঙ্গে করমর্দন করলেন তিনি। তারপর ডঃ বাসুকে প্রশ্ন করলেন, "কী ব্যাপার, বাসু? গতকাল টেলিফোনে যা বললে, তার মাথামুণ্ডু কিছুই তো বুঝতে পারিনি।"

"এখানে নয়, তোমার গবেষণাগারে চলো, সেখানেই বলব।"

"মনে হচ্ছে গোলমেলে ব্যাপার।"

"খুবই গোলমেলে।" গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিলেন ডঃ বাসু।

মিনিট পনেরোর ড্রাইভ। পথে আসতে-আসতে ডঃ বাসু আমাদের বললেন, "আভিদো আমার পুরনো বন্ধু। এ ধরনের একজন প্যাথোলজিস্ট মেলা ভার। আরও অনেক কথাই তাঁর সম্বন্ধে বললেন তিনি। আর সেই ফাঁকে যেন বোমা ফাটালেন ডঃ আভিদো।

"ভাল কথা। গতকাল এক ভদ্রলোক আমার গবেষণাগারে এসেছিলেন, বাসু। তোমরা যে রিপোর্টটির জন্য আমার কাছে এসেছ, তিনিও তার জন্যই এসেছিলেন। মনে হল আমেরিকান। স্প্যানিশ ভাষায় কথা বললেও বুঝতে অসুবিধে হয়নি, তিনি আমেরিকান।"

"তার মানে?" কথাটা শোনামাত্র আঁতকে উঠলেন ডঃ বাসু।

"অদ্ভুত একটা নাম বলেছিল, ফার্নিনান্দো লাপাজ..."

"দাঁড়াও, দাঁড়াও। চেহারা কেমন, বলো তো!"

"একেবারে তালপাতার সেপাই। বছর ষাটেক বয়েস হবে।"

"এ বার্নস্টাইন না হয়ে যায় না। ঘুঘু, একেবারে বাস্তুঘুঘু।" এবার ফেটে পড়লেন ডঃ বাসু। "তা, তুমি কী করলে?"

"যেভাবে অনুনয় করলেন," বললেন, "তিনি জীবাণুবিজ্ঞান নিয়ে বুয়েনস আইরেস-এ গবেষণা করছেন, তথ্যগুলি পেলে তাঁর সুবিধে হয়।"

"খুব ভাল। তা তুমি দিয়ে দিলে?"

"কী করব ? বড় বিনয়ী মানুষ। কথাবার্তা শুনে মনে হল পণ্ডিতও বটে।"

"খুব ভাল করেছ। প্যাথোলজিস্ট কিনা, কত আর তোমার বুদ্ধি হবে ? রোগের কারণ জানলে, হয়ে গেল। আরে বাবা, সেই কারণের পেছনেও যে কারণ থাকে সেটাও তো একবার খেয়াল করবে, আভিদো ?"

"কী বলতে চাও তুমি ?" ডঃ বাসুর রূঢ় কথায় ক্ষুণ্ণ হলেন ডঃ আভিদো।

"আমি দুঃখিত, বন্ধু। আসলে ব্যাপারটা এতই সাঙ্ঘাতিক, এই মুহূর্তে আমি মাথা ঠিক রাখতে পারছি না। আমাকে ক্ষমা করো।"

"ঠিক আছে, তোমার ধাত তো আমি জানি। বেতাল কিছু ঘটলেই তুমি চট করে রেগে যাও।" বলেই ডঃ আভিদো মৃদু করমর্দন করলেন ডঃ বাসুর। ডঃ বাসু এর পর আর কোনও কথা বললেন না।

॥ ৬ ॥

ডঃ আভিদোর গবেষণাগারটি খুবই আধুনিক। সেখানে পৌঁছেই কাজে নেমে পড়লেন ডঃ বাসু। রাজা তাঁকে সাহায্য করতে লাগল।

"আমাদের হাতে সময় খুব কম, আভিদো। যা কিছু করার তাড়াতাড়ি করেই আমাদের ফিরে যেতে হবে। লাপাজ আর কেউ নয়—তার আসল নাম গুস্তাফ বার্নস্টাইন। বড়সড় বিজ্ঞানী বটে, তবে এখন গোয়েন্দা— এজেন্ট।"

"হায় ভগবান ! বলছ কী তুমি, বাসু ?"

"ঠিক কথাই বলছি।"

"তা এত লোক কেন মারা গেল, সেটা জেনে তার লাভ !"

"সেটা তুমি এক্ষুনি বুঝতে পারবে ? এখন লাশকাটা ঘরে আমাদের নিয়ে চলো দেখি ?"

আমাদের শবব্যবচ্ছেদের ঘরে নিয়ে এলেন ডঃ আভিদো।

পর-পর তিনটি কাচের ঘর। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত। এক-একটি টেবিলের ওপর শুয়ে রয়েছে এক-একটি শব। রেড ইন্ডিয়ান। তাদের সারা দেহের ত্বক দাগড়া হয়ে উঠেছে। দাগড়াগুলির রং রক্তের মতো লাল। চোখগুলি ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে।

"কী বলব বাসু, আমার বাবার জন্মে এমন কেস কখনও দেখিনি। ওই যে দাগড়াগুলি দেখছ, ওতে এক ধরনের বিষাক্ত ছত্রাক পাওয়া গেছে। তবে সবই মৃত। তাই তাদের নিয়ে আমরা কোনও পরীক্ষা করতে পারিনি। তবে আমার মনে হয়েছে, ছত্রাকের বিষেই এরা মারা গেছে।"

"কী বুঝছেন, পেরালেজ ?" ডঃ বাসুর প্রশ্ন।

"পরীক্ষা না করে এক্ষুনি কিছু বলতে পারব না।" ডঃ পেরালেজ বললেন।

"বেশ, আপনি পরীক্ষা করে দেখুন। আভিদো আপনাকে সাহায্য করবেন। এই ফাঁকে আমি আর-একটি কাজ সেরে আসি। তোমার টেলিফোনটি আমি ব্যবহার করছি, আভিদো।"

"স্বচ্ছন্দে।"

"ধন্যবাদ।"

নিঃশ্বাস সুগন্ধে ভরায় প্রমিস, দাঁত সুস্থ বানায় প্রমিস।

এযে প্রমিস টুথপেস্টের দান রে।

প্রমিস টুথপেস্টে আছে লবঙ্গ তেলের গুণ ভরে, যা আপনার জন্যে দু'ভাবে কাজ করে - দাঁতের সবই কোণে-ছিদ্রে ঢুকে সেইসব জীবাণুকে নির্মূল করে, যারা আপনার দাঁতের গোড়া কুরেকুরে আলগা করে দেয় - আর নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ জন্মানোর জীবাণুগুলিকে দূর করে আপনার নিঃশ্বাস তাজা সুগন্ধে ভরে।

BALSARA বালসারা – টুথপেস্ট বিশেষজ্ঞ

প্রমিস — লবঙ্গ তেলওলা টুথপেস্ট

CHAITRA-B BLS 951 BEN

এর পর সাতটা দিন খুব ব্যস্ততার সঙ্গেই কাটালাম আমরা। আমরা মানে ডঃ আভিদো, ডঃ পেরালেজ, রাজা এবং আমি। ডঃ পিটার অ্যান্টোনিয়েভিচ এবং ডঃ বাসু "আমরা বাইরে থেকে ঘুরে আসছি," বলে কোথায় চলে গেলেন। কোথায় গেলেন, সে-কথা অবশ্য বললেন না।

সাতটা দিন আমরা নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালালাম। শবদেহের মস্তিষ্ক, অন্ত্র এবং বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মৃত কোষকলা নিয়ে চলল রাসায়নিক পরীক্ষা। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে খতিয়ে দেখলাম শবের মৃত কোষগুলির গঠন। আমি গামা রশ্মি বিকিরণ করে ছত্রাকগুলিতে কোনও পরিবর্তন হয় কি না পরীক্ষা করে দেখলাম। ডঃ আভিদো বলেছিলেন, শবদেহের ছত্রাকগুলি মৃত। কিন্তু দেখা গেল, বিশেষ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের গামা রশ্মির স্পর্শে তাদের মধ্যে যেন জীবনের স্পন্দন দেখা দিচ্ছে। এত সব করতে গিয়ে সাতটা দিন কীভাবে যে কেটে গেল, আমরা বুঝতেই পারলাম না।

"তা হলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই, ছত্রাকগুলি সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে।" এক সময় মন্তব্য করলেন ডঃ আভিদো।

"ঠিক তাই।" বললেন, ডঃ পেরালেজ।

"অবাক কাণ্ড। এমন অভিজ্ঞতার কথা আমি জীবনে কখনও শুনিনি।" বললাম আমি।

"আমরাও শুনিনি, ডঃ আভিদো।"

"আবার মিউটেশন।" ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের ওপর চোখ রেখে মন্তব্য করলেন ডঃ পেরালেজ। "ছত্রাকগুলির মধ্যে আবার সৃষ্টিগত পরিবর্তন এসেছে। এরা এখন ভিন্ন প্রজাতির ছত্রাক। গোড়ায় যা ছিল, তাই।"

"অদ্ভুত! এও কখনও হয় নাকি?" বেশ অবাকই হলেন ডঃ আভিদো।

"নিজের চোখেই দেখুন না?"

ডঃ আভিদো দেখলেন। আমরাও দেখলাম।

"তা হলে জৈবিক বিবর্তন এত দ্রুতও ঘটতে পারে?" ডঃ আভিদোর কণ্ঠে বিস্ময়।

"নিজের চোখেই তো দেখলেন।" বললেন ডঃ পেরালেজ।

"বুঝতে পারছি না, কী করে এটা সম্ভব হল।" বললেন ডঃ আভিদো।

সাতদিন পর ডঃ বাসু এবং অধ্যাপক অ্যান্টোনিয়েভিচ ফিরে এলেন। তাঁদের চোখ-মুখ দেখে বোঝা গেল, এই সাতদিনে তাঁদের মনের ওপর দিয়ে প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেছে।

"এখানকার কাজ শেষ। আমাদের আজই অস্টিনে ফিরে যেতে হবে। তোমার সাহায্যের জন্য তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ, আভিদো। রেড ইন্ডিয়ানদের মৃতদেহের প্যাথোলজি তুমি করছ, এই খবরটি পেয়েই তোমার কাছে ছুটে এসেছিলাম। বলতেই হয়, আমরা লাভবান হয়েছি।" বললেন ডঃ বাসু।

"কিন্তু ব্যাপারটা কী?" ডঃ আভিদো প্রশ্ন করলেন।

"সেটা তোমাকে পরে জানাব।"

সেদিন বিকেলেই লিমা থেকে আমরা যাত্রা করলাম। পরদিন দুপুর নাগাদ পৌঁছলাম অস্টিনে।

টেকসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে যেতেই রাজাগোপাল জানাল, "কে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন গতকাল। নাম বললেন ডঃ লাপাজ।"

"জানতাম সে আসবে।" গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিলেন ডঃ বাসু।

আমরা রীতিমত অবাক।

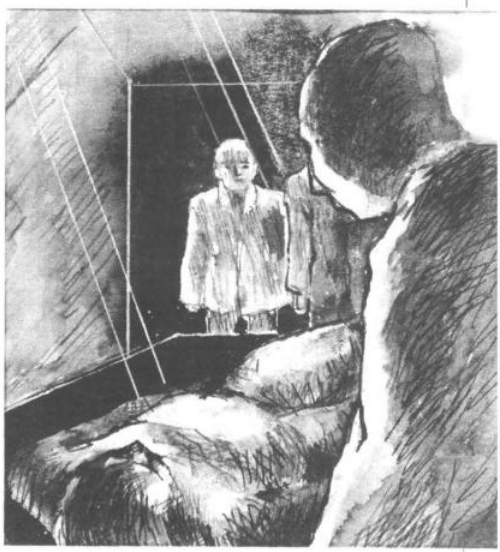

"আমাদের গবেষণার ব্যাপারে তিনি অনেক খবর রাখেন দেখলাম। এনজাইম এক্স সম্পর্কে কিছু তথ্য জানতে চাইলেন তিনি। আপনার নামও করছিলেন। বলছিলেন, আপনি নাকি তাঁর পুরনো বন্ধু।"

"বন্ধুই বটে! শয়তান!" মুহূর্তে রাগে যেন ফেটে পড়লেন ডঃ বাসু। "গামা বিকিরণের কথা তাকে বলোনি তো, এলাইজা?" এলাইজা পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে প্রশ্ন করলেন ডঃ বাসু।

"তা নিয়ে তিনি কোনও প্রশ্ন করেননি।" বলল এলাইজা।

"যাক। তবু রক্ষে, এ-ব্যাপারটা সে জানে না।" ডঃ বাসু যেন আশ্বস্ত হলেন। তারপর রাজাগোপালকে বললেন, "এনজাইম এক্স-এর ব্যাপারে যা কিছু নথিপত্র রয়েছে তা যাতে বেহাত না হয়, লক্ষ রেখো, রাজা। ডঃ পেরালেজ, এ দায়িত্ব আপনার ওপরও রইল। ব্যস। আপাতত এই পর্যন্ত। আজ ডিনারের পর আমার ঘরে আসুন। আশা করি তখন বেশ কিছু নতুন কথা শোনাতে পারব আপনাদের।" বলেই ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেলেন ডঃ বাসু।

হঠাৎ তাঁর এমন আচরণে অবাকই হলাম আমরা। তখনও জানতাম না, ডিনারের পর তিনি যা শোনাবেন সেটা আরও বেশি অবাক হওয়ার মতো কথা।

রাত ন'টা নাগাদ আমরা সবাই তাঁর ড্রইং-রুমে গিয়ে হাজির হলাম। ডঃ পেরালেজ, অধ্যাপক অ্যান্টোনিয়েভিচ, রাজা, জেমস ওয়েলচ, এলাইজা এবং আমি।

কোনও ভূমিকা না করে শুরু করলেন ডঃ বাসু, "শুনুন, ডঃ পেরালেজ, প্রথমেই আপনাকে বলি, লিমায় আপনাদের রেখে পিটারকে নিয়ে প্রথমে আন্দিজের সেই অঞ্চলে গিয়েছিলাম, যেখানে অদ্ভুত মহামারীতে প্রচুর রেড ইন্ডিয়ান মারা পড়ে। সেখানে গিয়েই খবর পেলাম মহামারীর আগে একজন লোক সদলবলে গরিবদের সাহায্য করতে গিয়েছিল সেখানে। সেখানে গিয়ে সে রেড

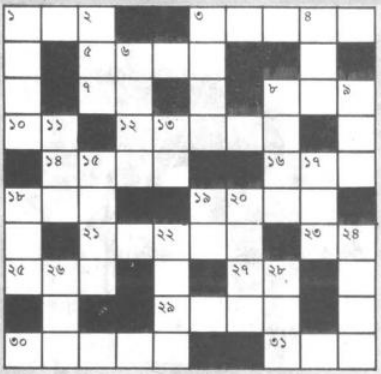

সংকেত : পাশাপাশি : (১) নূপুর। (৩) চৌকিদার। (৫) এটা খাওয়া মানেই গলদ্‌ঘর্ম অবস্থা। (৭) চিত্ত, হৃদয়। (৮) বিশ্বকর্মার — হাতি। (১০) অগাধ জল, সংকট। (১২) খবরের কাগজ, দুধ ইত্যাদির গ্রাহকরা জোগানদারদের সঙ্গে সাধারণত এই ব্যবস্থা করে নেয়। (১৪) মৃদু বৃষ্টিপাতের শব্দ। (১৬) সংগীতের তালবিশেষ। (১৮) হঠাৎ যদি খাও, মা-ঠাকুমা 'ষাট্ ষাট্' করবেন। (১৯) হাতির রাজা। (২১) গ্রহনক্ষত্রের গতিবিধি জানাতে, বোঝাতে কৃত্রিম আকাশ। (২৩) এ আর সময় কারও জন্য অপেক্ষা করে না। (২৫) অরণ্যে জন্ম যার। (২৭) চতুষ্কোণ ক্ষেত্র। (২৯) ফুলের মধু। (৩০) এমন জায়গায় রাতবিরেতে একা থাকলে গা-ছমছম করে। (৩১) স্থিতিস্থাপক দ্রব্য, উৎস এই নামের গাছ।

উপর-নীচ : (১) রাজসিংহাসন। (২) পরম করুণাময়। (৩) ঐর কুটির ক্রীতদাসপ্রথা নিয়ে এক মর্মস্পর্শী উপন্যাস—অবশ্য বঙ্গানুবাদে। (৪) জলের ধারের পাখি। (৬) ব্যাকরণে রূপক সমাসের একটি উদাহরণ। (৮) বর্ষায় অঝোরে ঝরে। (৯) অস্থায়ী। (১১) এতে বিষাদ মানেই আনন্দ মাটি। (১৩) সমান, তুল্য। (১৫) যাঁর নামে পৃথিবীবিখ্যাত এক স্মৃতিসৌধ। (১৭) দাঁতের দেখ্‌ভাল করে। (১৮) যে-সময়ে দিনরাত সমান হয়। (১৯) গাল। (২০) মাছ,কুমির,কচ্ছপ ইত্যাদি। (২২) ভেলভেট। (২৪) পিলসুজ। (২৬) যেদিক থেকেইপড়ো না কেন পদ্ম পদ্মই থাকবে। (২৮) পর্বতগুহা।

গত সংখ্যার সমাধান

রা	জ	প	থ			টা	ই	স	ন
জ	ল		ত	রু	ত	ল			ক
ক	ত		ম	রু		মা	ই	ফে	ল
	র	জ	ত		কা	টা		টি	ন
র	ঙ্গ	ন		আ	ম	ল	কী		বি
ক		ম	শ	ক	রা		ল	ক	স
ম	ই		হ	র		বি	ক	র্ণ	
স	হ	কা	র		ব	হ		সু	ত
ক			ত	পো	ভ	ঙ্গ		ব	ল
ম	ল	য়া	লি			ম	হা	র্ণ	ব

ইন্ডিয়ানদের সাহায্যের নামে খাবার বিলি করে। সেই খাবার খেয়েই তারা মহামারীতে আক্রান্ত হয়। লোকটির বিবরণও দিয়েছে সেখানকার কিছু অধিবাসী। তাদের বিবরণ শুনে আমার বুঝতে অসুবিধে হয়নি, লোকটি আসলে বার্নস্টাইন। ডঃ পেরালেজ, আপনি তাঁকে একটি টেস্টটিউব-ভর্তি বিচিত্র এবং বিষাক্ত ছত্রাকের যে নমুনা দিয়েছিলেন, সেই ছত্রাকই সে রেড ইন্ডিয়ানদের খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিল। এর ফলেই মহামারী দেখা দেয়। মানুষ মারার ব্যাপারে ওই ছত্রাক কতটা সক্রিয় সেটা যাচাই করতেই সে এ কাজ করেছিল। আর তার ফলটি কী দাঁড়িয়েছিল, সে তো ডঃ আভিদোর গবেষণাগারেই দেখছেন। বলতে পারেন, জীবাণুযুদ্ধের প্রয়োজনেই কয়েকশো দরিদ্র মানুষকে গিনিপিগ হিসেবে ব্যবহার করে বার্নস্টাইন।"

"কী বলছেন, ডঃ বাসু?" বিস্ময়ে হতবাক হল জিম।

"সবুর করো। এইসঙ্গে আর-একটি ভয়ঙ্কর কথা বলি," বলে চললেন ডঃ বাসু, "পিটার, প্রথমে ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারিনি। বুঝলাম, প্যাসাডিনায় গিয়ে আমার এক বন্ধু, জেট প্রপালশন ল্যাবরেটরির এক উপগ্রহ-বিজ্ঞানী। অনিবার্য কারণে তার নামটি আমি বলছি না, তার সঙ্গে কথা বলার পর, আপনার রহস্যটি আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। সেদিন আপনি ঠিকই দেখেছিলেন। এলাইজা, তোমার কথাও ঠিক। আসল ব্যাপারটা এই : ওইদিন সূর্যের পরিমণ্ডলে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটেছিল। তার ফলে ছড়িয়ে পড়ে প্রচণ্ড শক্তিশালী চৌম্বক-ক্ষেত্র। সেই চৌম্বক-ক্ষেত্র একটি সামরিক কৃত্রিম উপগ্রহের গামা বিকিরণের টর্চটি চালু করে দেয় কম্পিউটারে গোলযোগ ঘটিয়ে। এর ফলে সেই টর্চ থেকে বিশেষ তরঙ্গ-রশ্মি এসে পড়েছিল ডঃ পেরালেজের সেই টেস্টটিউবের ওপর, যার মধ্যে ছিল বিচিত্র এক ধরনের ছত্রাক। গামা রশ্মির স্পর্শে ছত্রাকগুলির 'ডি এন এ'-তে আসে পরিবর্তন। তারা নতুন এক ধরনের প্রজাতিতে পরিবর্তিত হয়। এলাইজা, এটা যে ঠিক,গবেষণাগারে সে তো নিজের চোখেই দেখেছ তুমি।"

"দ্যাটস রাইট, সার।" ডঃ বাসুর কথায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল এলাইজার দুটি চোখ।

"এলাইজার পরীক্ষাটি আমাকেও অবাক করেছে, ডঃ বাসু। জীবজগতের দ্রুত জৈবিক বিবর্তনে গামা রশ্মিরও যে হাত রয়েছে, এখন আমি বিশ্বাস করতে শুরু করেছি।"

"সবুর করো। শেষটুকু বলে নিই।" বলে চললেন ডঃ বাসু, "পিটার, ওই সামরিক উপগ্রহে এক প্লুটোনিয়াম বোমাও ছিল। সৌর বিস্ফোরণের দরুন তার কম্পিউটার চালু হয়ে গিয়ে বোমাটিতে বিস্ফোরণ ঘটায়। সৃষ্টি করে বিরাট মেঘ। প্রচণ্ড সৌর-ঝড়ে সেই মেঘকেই সেদিন তুমি দূরবিনে দেখেছিলে।"

"কী বলছ তুমি, বাসু?" অধ্যাপক অ্যান্টোনিয়েভিচ ডঃ বাসুর কথায় যেন ভিরমি খেলেন।

"ঠিকই বলছি। মহাকাশে অনেক বিপজ্জনক কাজই চালানো হচ্ছে, পিটার। পৃথিবীর মানুষ তার খবর রাখে না। যাই হোক, বার্নস্টাইনকে ঠেকিয়ে রাখতে হবে। ছাত্রাকগুলির বিবর্তনে যে গামা রশ্মির ভূমিকা রয়েছে, সেটা এখনও সে জানে না। যাতে সে না জানতে পারে, সেটা অবশ্যই আপনারা দেখবেন, ডঃ পেরালেজ।"

ডঃ বাসু শেষ করলেন তাঁর বক্তব্য।

আমরা তখন প্রায় পাথর হয়ে গেছি।

এমন ঘটনাও যে ঘটতে পারে, সে কি ভাবা যায়? (সমাপ্ত)

ছবি : বিশ্বপতি মাইতি

এদিকে কেউ নেই। চারদিক একবার দেখে নিই।
?
ভৌ !
ভৌ ! ভৌ !
মরেছি
ভৌ ! ভৌ !
ভৌ !! ভৌ !!
?
ভৌ !! ভৌ !!
কুটুস ! কুটুস ! ওকে জ্যান্ত গিলে খাবে !
ভৌ !
কুঁইই-কুঁইই
গর্‌র্‌

কৃষ্ণ দ্বীপের রহস্য

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

ব্যাট ম্যান
কব-এর খামারবাড়ি—ব্রুস আর ডিক যখন ঘুমোচ্ছে, তখন অসৎ চিত্রব্যবসায়ী ম্যাক্সওয়েল এক জঘন্য কাজে যাচ্ছে…
উহ্…
ব্যস ! দুঃখিত, বন্ধু, … কিন্তু এক বোকা চাষি জানে না যে, তার ঘরে আছে আমেরিকার শ্রেষ্ঠ শিল্পীর কিছু মূল্যবান ছবি… ভাবপ্রবণ লোকটা ওগুলি বিক্রিও করবে না। তাই ওর মন বদলাতে তোমাকে কাজে লাগাচ্ছি !
খাসা ! বাড়তি একপ্রস্থ পোশাক আছে ! আর এই ওর হাতের লেখার নমুনা ! ধরনটা সহজ ! জাল করতে কষ্ট হবে না !
খুনি কয়েক মিনিট ব্যস্ত থাকল… তারপরে তৃপ্তিতে হাসল…
আত্মহত্যা বলেই মনে হবে ! চিঠিতে কারণটা লেখা থাকবে !
ফিরে এসে ম্যাক্সওয়েল ধূর্তের মতো জাল পাতল…
কব যেন পোশাকটা নির্ভুল চিনতে পারে… এবং বোকা ওয়েন আর ছেলেটা দেখলে তো আরও ভাল ! বালতি নাড়লেই ঘুম ভাঙবে …
ঠন !
কিসের শব্দ ,… ? নিশ্চয় গোলাবাড়িতে চোর ঢুকবার চেষ্টা করছে…
এই ! তুমি কী করছ ! আরে ! তুমি না সার্কাসে ট্রাপিজের খেলা দেখাও ! তবে রে !
ঠিক ! সেই খেলার একটু নমুনা দেখাচ্ছি, যার কথা তুমি পুলিশকে বলতে পারবে !
এদিকে, শব্দে অন্য দুজনও জেগে গেছে…
মনে হচ্ছে সার্কাসের লোকটা, যে ট্রাপিজের খেলা দেখায় ! ওর মারে কব বেহুঁশ ! ডিক, আমাদের পোশাক…!
আমি বের করে ফেলেছি !
হালকা পোশাকে দুটি লোক ছুটল…
ব্যাটম্যান আর রবিন ! কী করে… ?
তুমি সার্কাসের তাঁবু ছেড়ে এত দূরে ! সন্তোষজনক উত্তর দিতে না পারলে মুশকিলে পড়বে !

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

ধারাবাহিক উপন্যাস

সোনার গণপতি হিরের চোখ

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

"হ্যাঁ কিন্তু মুড়ি খাবি কী করে ?"

তিন্নি বলল, "শুভদা, আর পাঁচটা টাকা দেবে ? তা হলে এক্ষুনি হাটে গিয়ে কিছু চিঁড়ে কিনে আনতুম।"

বিল্টু বলল, "না, তোকে কোথাও যেতে হবে না। হাট আমি দেখে এসেছি। আমিই কিনে আনছি ওখান থেকে। তুই ঘরে থাক।"

বিল্টু শুভঙ্করের কাছ থেকে টাকা নিয়ে হাটে গেল। তারপর চিঁড়ে, ছাতু আর মিষ্টি কিনে আনল কিছু। মুড়ির সঙ্গে ভিজিয়ে তাই মেখেই পেট পুরে খেল ওরা তিনজনে। তারপর তিন্নি করল কি, কলার পেটোয় মোড়া সেই সোনার গণপতিকে দিদিমার ঠাকুরঘরে অন্ধকারে একটি মাটির জালার ভেতর ঢুকিয়ে রেখে বিল্টু ও শুভঙ্করকে ইশারা করল, "চলো।"

ওরা দিদিমাকে প্রণাম করে যাওয়ার জন্য তৈরি হল।

দিদিমা বললেন, "তোরা ফিরবি কখন ?"

"ঠিক নেই। রাত্রিও হতে পারে আবার সকালও হয়ে যেতে পারে।"

দিদিমা বললেন, "আমার কিন্তু ভয় করছে খুব।"

তিন্নি বলল, "ভয় নেই। তোমার আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে যাচ্ছি। কে কী করবে আমাদের ? যাই হোক, তুমি কিন্তু সাবধানে থেকো। ঘরের দরজা বন্ধ করে রেখো সব সময়। আর কেউ যদি আমাদের খোঁজে এখানে আসে তা হলে বোলো আমরা এসেছিলাম, তোমার সঙ্গে দেখা করেই কলকাতায় ফিরে গেছি।"

"তোদের খোঁজে কে আসবে এখানে ?"

"তা জানি না। চোর-ডাকাতও আসতে পারে, আবার পুলিশও আসতে পারে।"

দিদিমা শিউরে উঠলেন, "ও মাগো !"

"তুমি দরজায় খিল দাও দিদিমা।"

দিদিমা সভয়ে বললেন, "সিদ্ধিদাতা গণেশ, সিদ্ধিদাতা গণেশ।"

ওরা দিদিমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গ্রাম্যপথ ধরে বড় রাস্তায় এল। বেলপাহাড়ির একটি বাস ঝাড়গ্রামের দিক থেকে এসে থেমেছে তখন। ওরা ছুটে গিয়ে সেই বাসে উঠে পড়ল। শুধু উঠে পড়া নয়। ওঠা মাত্রই বসার জায়গাও পেয়ে গেল ওরা। সে কী আনন্দ ওদের।

বাস শিলদা থেকে ছেড়ে এগিয়ে চলল বেলপাহাড়ির দিকে। বেলপাহাড়ি এখান থেকে খুব কাছে। হেঁটে যাওয়া যায়। বাসে মিনিট কুড়ি সময় লাগল। বেলপাহাড়িতে ওরা যেই না বাস থেকে নেমেছে, অমনই কোথা থেকে দানবাকৃতি লোকটা রক্তচক্ষু হয়ে একটা পাঁঠা কাটা দা নিয়ে ভয়ঙ্কর ক্রোধে ছুটে এল ওদের দিকে, "বাংখাম গুজুয়া। হর জয়েদ তেদো বাঙ দহমেয়া।" অর্থাৎ তোরা মরবি। তোদের সহজে ছাড়ব না।

তিন্নি, বিল্টু ও শুভঙ্কর ভয়ে আর্তনাদ করে ঢুকে পড়ল একটা হোটেলের মধ্যে। প্রচণ্ড ভয়ে কাঁপতে লাগল ওরা। পথিমধ্যে লোকজন যারা ছিল তারা সব হইহই করে উঠল। হঠাৎ দু'জন লোক পেছনদিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওই লোকটার পায়ের খাঁজে সজোরে একটা লাথি মারতেই লোকটা মুখ থুবড়ে পড়ে গেল রাস্তার ওপর।

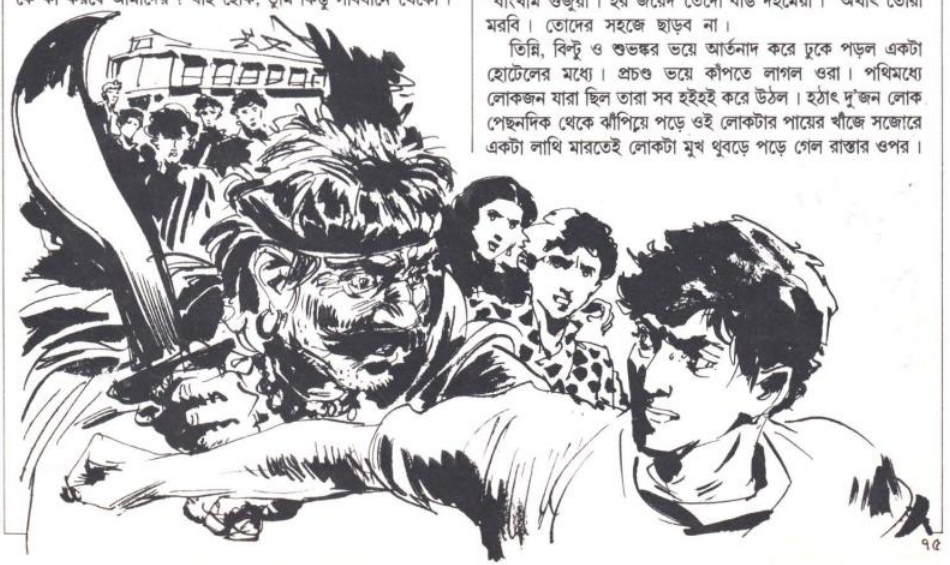

বাদল মেঘের গান

পরেশ সরকার

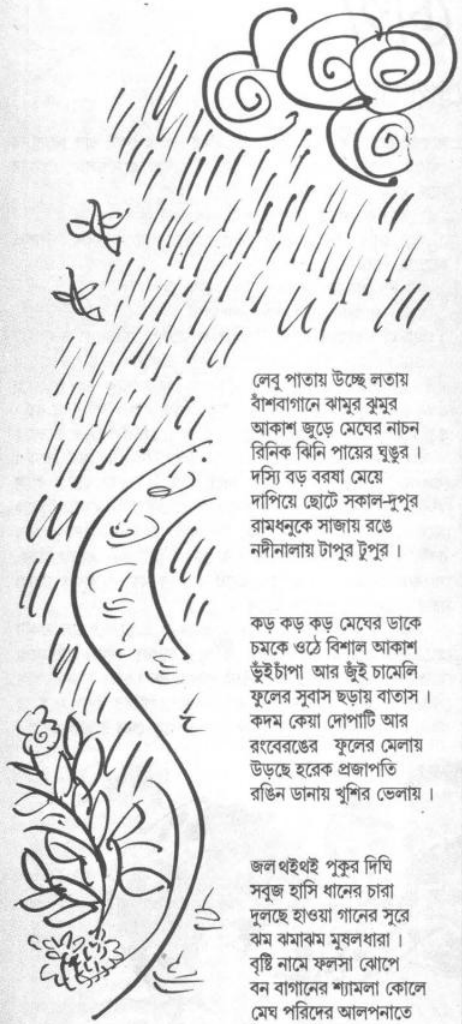

লেবু পাতায় উচ্ছে লতায়
বাঁশবাগানে ঝামুর ঝুমুর
আকাশ জুড়ে মেঘের নাচন
রিনিক ঝিনি পায়ের ঘুঙুর।
দস্যি বড় বরষা মেয়ে
দাপিয়ে ছোটে সকাল-দুপুর
রামধনুকে সাজায় রঙে
নদীনালায় টাপুর টুপুর।

কড় কড় কড় মেঘের ডাকে
চমকে ওঠে বিশাল আকাশ
ভুঁইচাঁপা আর জুঁই চামেলি
ফুলের সুবাস ছড়ায় বাতাস।
কদম কেয়া দোপাটি আর
রংবেরঙের ফুলের মেলায়
উড়ছে হরেক প্রজাপতি
রঙিন ডানায় খুশির ভেলায়।

জল থইথই পুকুর দিঘি
সবুজ হাসি ধানের চারা
দুলছে হাওয়া গানের সুরে
ঝম ঝমাঝম মুষলধারা।
বৃষ্টি নামে ফলসা ঝোপে
বন বাগানের শ্যামলা কোলে
মেঘ পরিদের আলপনাতে
চাঁদের হাসি দোদুল দোলে।

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

হাতের দা-টা ছিটকে গিয়ে লাগল রাস্তার একটা মাইল পোস্টে। আর-একটু হলেই একটা ঘুমন্ত কুকুরের গায়ে গিয়ে লাগত সেটা। কুকুরটা চমকে উঠে ভয়ে চিৎকার করে লেজ গুটিয়ে পালাল সেখান থেকে।

একজন ছুটে গিয়ে দা-টা কুড়িয়ে নিল।

বাকি লোকরা সবাই মিলে সেই লোকটিকে ধরে ফেলেছে তখন। হুমড়ি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে যাওয়ার ফলে লোকটির অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয়। সামনের দুটো দাঁত নড়ে গিয়ে ঠোঁট কেটে সে কী রক্ত। লোকটি তখন ধুলোয় শুয়ে হাত-পা ছুঁড়ছে আর মুখ দিয়ে বিকট চিৎকার করছে।

বিল্টু, তিন্নি ও শুভঙ্কর যে হোটেলের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল, তার মালিক বললেন, "ভয় নেই তোমাদের। ও আর কিছু করবে না। এখন ওইরকম চিৎকার আর দাপাদাপি করবে কিছুক্ষণ। তারপর ঠিক হয়ে যাবে। তোমরা এবার যেতে পারো।"

শুভঙ্কর বলল, "তা যাচ্ছি। কিন্তু ও ওইভাবে আমাদের আক্রমণ করতে এল কেন?"

"লোকটা পাগল। তবে ওর হাতে ওই মারাত্মক জিনিসটা যে কীভাবে এল তা ভেবে পাচ্ছি না। নিশ্চয়ই কারও অন্যমনস্কতার সুযোগে ওটাকে ও চুরি করে এনেছে। যাই হোক, ব্যাপারটা দেখতে হচ্ছে।"

বিল্টু বলল, "কিছু লোক হঠাৎ উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে লোকটাকে ফেলে না দিলে ও তো কেটেই ফেলত আমাদের।"

"তা ফেলত। শুধুমাত্র ভাগ্যের জোরে বেঁচে গেছ তোমরা।"

ওরা আর সেখানে না থেকে সোজা রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল।

পাগলটাকে ঘিরে তখন স্থানীয় লোকেদের ভিড় জমাট বেঁধেছে। দারুণ কোলাহল শুরু হয়ে গেছে সেখানে। হবে নাই-বা কেন? আর-একটু হলেই তো মারাত্মক একটা হত্যাকাণ্ড ঘটে যেত প্রকাশ্য দিবালোকে। কী সাঙ্ঘাতিক দৃশ্যের সৃষ্টি হত।

ওরা তিনজনে এবার নির্ভয়ে সামনের দিকে কিছুটা এগিয়ে বাঁ দিকে মোড়ের মাথায় বাঁক নিল। কাঁকড়াঝোরের যাত্রীরা এই পথ ধরে ভুলাভেদা, শিয়ারবিদার দিকে চলে যায়।

যাত্রাপথে চারদিকে তাকিয়ে দেখতে-দেখতে শুভঙ্কর বলল, "বিল্টু! এই নাকি বেলপাহাড়ি, এরই এত নামডাক? ডি এফ ও-র বাংলোটায় দিকে তাকিয়ে দ্যাখ, ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে আছে। এই বেলপাহাড়ির কত নামডাক শুনেছিলুম। প্রকৃতিপ্রেমিক মানুষরা দলবেঁধে ছুটে আসেন এখানে। কিন্তু কেন আসেন বল তো? কী আছে এখানে? না আছে টিলা, না আছে কোনও গাছপালা, মুঠোর মধ্যে ধরা যাবে এমন একটি হতশ্রী গ্রাম আর ধানখেত ছাড়া কিছুই তো নেই। বহুদূরে কিছু পাহাড়ের রেখা অবশ্য আছে।"

এক বৃদ্ধ একটি খোড়োঘরের মাটির দাওয়ায় বসে বোধ করি শুনতে পেলেন ওদের কথা। বললেন, "তোমরা কারা হে? কোথা থেকে আসছ?"

শুভঙ্কর বলল, "আমরা কলকাতার দিক থেকে আসছি।"

"কলকাতার দিক থেকে মানে?"

"মানে, হাওড়া থেকে আসছি। বাজে শিবপুর।"

"অ। তা কী ব্যাপারে একটু জানতে পারি কি?"

বিল্টু বলল, "ব্যাপার কিছুই নয় দাদু। আসলে আমরা শরৎকালের প্রকৃতি দেখব বলে শহর থেকে গ্রামে এসেছি। শুনেছি বেলপাহাড়ির সৌন্দর্য নাকি অপরিসীম। কিন্তু এখানে এসে এর কোনওরকম সৌন্দর্যই না দেখতে পেয়ে আমাদের মন ভরল না।"

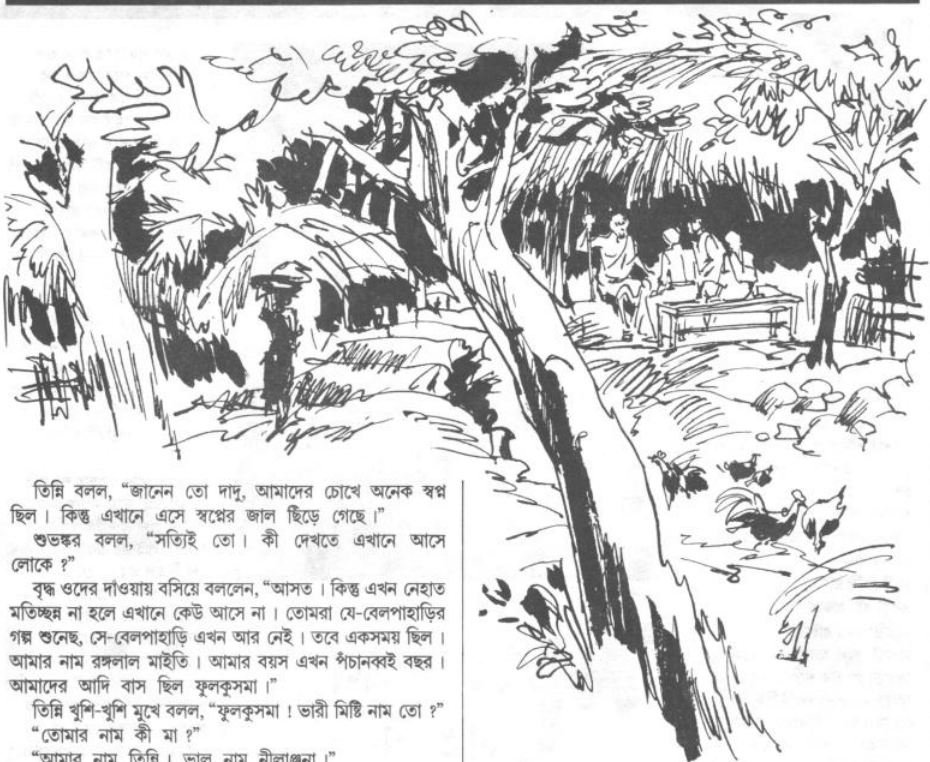

তিন্নি বলল, "জানেন তো দাদু, আমাদের চোখে অনেক স্বপ্ন ছিল। কিন্তু এখানে এসে স্বপ্নের জাল ছিঁড়ে গেছে।"

শুভঙ্কর বলল, "সত্যিই তো। কী দেখতে এখানে আসে লোকে?"

বৃদ্ধ ওদের দাঁওয়ায় বসিয়ে বললেন, "আসত। কিন্তু এখন নেহাত মতিচ্ছন্ন না হলে এখানে কেউ আসে না। তোমরা যে-বেলপাহাড়ির গল্প শুনেছ, সে-বেলপাহাড়ি এখন আর নেই। তবে একসময় ছিল। আমার নাম রঙ্গলাল মাইতি। আমার বয়স এখন পঁচানব্বই বছর। আমাদের আদি বাস ছিল ফুলকুসমা।"

তিন্নি খুশি-খুশি মুখে বলল, "ফুলকুসমা! ভারী মিষ্টি নাম তো?"

"তোমার নাম কী মা?"

"আমার নাম তিন্নি। ভাল নাম নীলাঞ্জনা।"

"তবে! তুমিও কি মিষ্টি কম? তা ওই ফুলকুসমা হল গে বাঁকড়ো জেলায়। যেমন তুমি মিষ্টি, তেমনই ওই ফুলকুসমাও মিষ্টি। আসলে ফুলকুসমা একটি নদীর নাম। নদীর নামেই গ্রামের নাম। ঘন জঙ্গলে পূর্ণ এক শ্যামল উপত্যকায় সেই ছোট্ট মিষ্টি নদীটি তিরিতিরি বয়। তা বিশেষ কারণে সেইখান থেকে যখন আমরা বরাবরের জন্য এই বেলপাহাড়িতে চলে আসি, এর রূপই তখন আলাদা।"

শুভঙ্কর বলল, "আপনি কত বছর আগেকার কথা বলছেন?"

"তা ধরো না কেন, আমি বলছি আশি বছর আগেকার কথা। আমার বয়স তখন পনেরো। এই বেলপাহাড়িতে ছিল শাল-মহুয়ার বন। এক-একটা সেগুন গাছের চেহারা দেখলে মাথা খারাপ হয়ে যেত। সেইসব সেগুন গাছকে জড়িয়ে আবার বেড়ে উঠত বড়-বড় চিহড়লতার গাছ। আর ছিল অসংখ্য টিলা। কত যে ঝরনা ছিল সেইসব টিলা-পাহাড়ে, তার যেন লেখাজোখা নেই। জোছনা রাতে তারাভরা আকাশের নীচে সেইসব ঝরনায় হরিণরা যখন জল খেতে আসত দলে-দলে, আমাদের তখন আনন্দের আর শেষ থাকত না। আদিবাসীরা সারারাত ধরে ধামসা-মাদল বাজিয়ে গান করত। বাঁধনা পরবের দিন সারারাত নাচগান হত। তখনকার সেই জঙ্গল দেখলে বুক শুকিয়ে যেত, বুঝেছ? সেই জঙ্গলময় তখন ঘুরে বেড়াত ভালুক আর চিতাবাঘের দল।"

তিন্নি বলল, "বলেন কী! তার এই হাল?"

"হ্যাঁ। সভ্যতা। আমরা সভ্য হচ্ছি না? সভ্যতার অসুখে এখন সবকিছু ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। সেই অরণ্যকে আমরা নির্মূল করেছি। বন্যপ্রাণীদের নির্বিচারে হত্যা করেছি। সেইসব টিলা-পাহাড়কে কেটে খণ্ড-খণ্ড করে পিচ ঢেলে পাকা রাস্তা বানিয়েছি। কাজেই ঝরনা শুকিয়ে গেছে। প্রকৃতি শ্রীহীন হয়েছে। ট্রাক্টর দিয়ে মাটি চষে চাষের জমি তৈরি করে ফসল ফলাচ্ছি। এটার অবশ্য প্রয়োজন ছিল। কিন্তু অরণ্য নিধনের কোনও প্রয়োজন ছিল না। অরণ্যভূমি না থাকলে যে নিত্যনতুন ধূমকেতু উঠবে প্রকৃতির বুকে, সে বুদ্ধি তখন ছিল না কারও। কাজেই সারাদেশ এখন অনাবৃষ্টিতে কাঁদছে। খরায় জ্বলছে। কোথাও কোনও গাছ নেই। তৃণ নেই। ভাদ্রের গুমোটে পরান আইঢাই করছে। তা এই যখন অবস্থা, তখন এখানে এসে কী দেখবে বাবা তোমরা? এই যে ধরো না কেন, এমন একটা শরৎকাল এল, কখন যে শিউলি ফুটল, সে ফুল কার উঠোনে ঝরল, সে খবর কে রাখে? সারা বেলপাহাড়িতে কারও ঘরে এখন একটা শিউলি গাছ আছে কিনা সন্দেহ। ওই দ্যাখো, পুকুর আছে মাছ নেই। দিঘিতে শালুক-পদ্ম নেই। গাছ নেই, তাই গাছের ডালে পেখম মেলে ময়ূর নাচে না। রাখালিয়া বাঁশির সুরে উন্মনা হয় না কেউ। রাখাল বালকের হাতে এখন ট্রানজিস্টর। তাতে আধুনিক গান। এক নতুন যুগের হাওয়ায় সব কিছু যেন উলটেপালটে গেছে ভাই।"

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

(ক্রমশ)

পিটম্যান

শর্টহ্যাণ্ড এল কীভাবে

কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে স্টেনোগ্রাফাররা শর্টহ্যাণ্ডে লিখে ফেলেন প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি লাইন। কী এই শর্টহ্যাণ্ড ?

শর্টহ্যাণ্ড বলতে বোঝায় দ্রুত হাতে লেখা। একজন মানুষ মুখে যত তাড়াতাড়ি কথা বলতে পারে তত তাড়াতাড়ি সেগুলি হাতে লিখতে পারে না। শর্টহ্যাণ্ডের আর-একটি প্রতিশব্দ হল 'স্টেনোগ্রাফি' (গ্রিক ভাষায় 'স্টেনোস' শব্দের অর্থ জায়গা বাঁচানো। 'গ্রাফিন' মানে, লেখা।) শর্টহ্যাণ্ডে এরকম তাড়াতাড়ি লেখা আদৌ নতুন নয়, গ্রিকরা সম্ভবত এটির ব্যবহার জানতেন। রোমানরা অবশ্যই শর্টহ্যাণ্ডে লিখতেন, স্কুলের ছাত্রদের এই শর্টহ্যাণ্ড শেখানো হত।

আধুনিক শর্টহ্যাণ্ডের ইতিহাস খুঁজতে গেলে পিছিয়ে যেতে হবে ১৫৮৮ সালে।

ডঃ টিমোথি ব্রাইট একটি বই প্রকাশ করেছিলেন। ব্রাইটের নিয়মটি শেখা অবশ্য বেশ কষ্টসাধ্য, সেখানে প্রত্যেক শব্দের জন্য আলাদা-আলাদা একটি চিহ্ন রয়েছে। জন উইলিসের 'আর্ট অব স্টেনোগ্রাফি' বইটি ১৬০২ সালে প্রকাশিত হয়েছিল, ১৬৪৭ সালের মধ্যে সেই বইটির চোদ্দটি সংস্করণ বেরিয়ে গিয়েছিল। উইলিসের পদ্ধতিটিকে টি শেল্টন আর-একটু উন্নত করেছিলেন, স্যামুয়েল পেপিজ শেল্টনের পদ্ধতিটিই অনুসরণ করতেন। তাঁর সমস্ত ডায়রি শর্টহ্যাণ্ডে লেখা।

উইলিস ও তাঁর পরবর্তী সকলের শর্টহ্যাণ্ড পদ্ধতি অক্ষরের ওপর নির্ভরশীল। প্রতিটি বর্ণ বা অক্ষর একটি সোজা বা বাঁকা রেখা দিয়ে চিহ্নিত করা হয়, কোনও-কোনও রেখায় আবার জুড়ে দেওয়া হয় আংটার মতো একটি ছোট্ট রেখা। স্বরবর্ণগুলিকে নির্দেশ করা হত আবছাভাবে, ফলে এই পদ্ধতি নিয়েও আস্তে-আস্তে বিতর্ক গড়ে ওঠে। তখন, বর্ণ-পদ্ধতির বদলে এল উচ্চারণ-পদ্ধতি (ফোনেটিক্স)। এই পদ্ধতিতে শর্টহ্যাণ্ড শব্দের উচ্চারণের ওপর নির্ভরশীল, লেখার অক্ষর বা বর্ণের ওপর নয়।

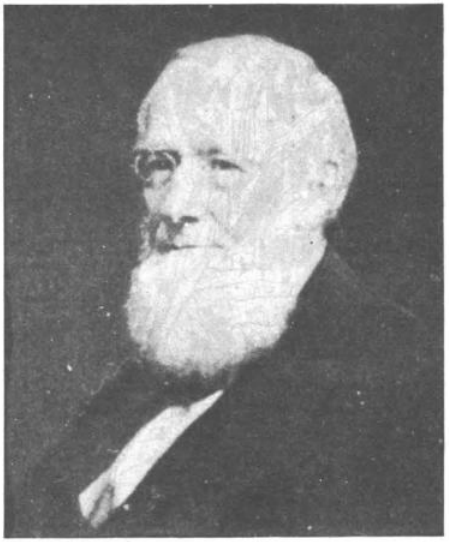

শর্টহ্যাণ্ডের মূল ভিত্তি হল শব্দের উচ্চারণ। লেখার সময় সাধারণ শব্দের বানানে অনর্থক কিছু বর্ণ বা অক্ষর ব্যবহৃত হয়। শর্টহ্যাণ্ডে লেখার সময় শুধুমাত্র উচ্চারিত বর্ণটিই গুরুত্বপূর্ণ, লেখ্য বানানের অনর্থক শব্দগুলি সেখানে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। যখন একটি বর্ণের উচ্চারণ দু'রকম (g অক্ষরটি 'give' ও 'ginger':দুই শব্দে দু'রকমভাবে উচ্চারিত হয়।) তখন শর্টহ্যাণ্ডের চিহ্নগুলিও আলাদা।

অষ্টাদশ শতকে একের পর এক অনেক শর্টহ্যাণ্ড-পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে, কোনওটিই শেষ অবধি ধোপে টেকেনি। বিখ্যাত স্টেনোগ্রাফার সার আইজ্যাক পিটম্যান (১৮১৩-'৯৭) প্রথমে টেলরের পদ্ধতিতে কাজ শুরু করেছিলেন, পরে নিজস্ব এক পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। গ্রেট ব্রিটেন ও আমেরিকায় তাঁর পদ্ধতি দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, ইংরেজি ছাড়া অন্য কয়েকটি ভাষাতেও ওই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এখনও এটি বিশ্বের সবচেয়ে প্রচলিত শর্টহ্যাণ্ড-পদ্ধতি। অবশ্য, বেল, স্লোন, গ্রেগ—এঁদের নিয়মও প্রায়ই ব্যবহৃত হয়।

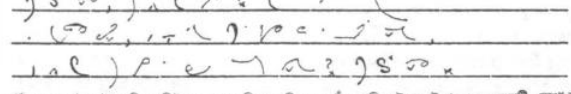

শর্টহ্যাণ্ডের এই লাইনগুলিতে পিটম্যানের পদ্ধতিতে 'তিন অন্ধ ইঁদুর' (থ্রি ব্লাইন্ড মাইস) নামের ছড়াটি লেখা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, গাঢ় ও হালকা বিভিন্ন রেখার সমন্বয়ে এই পদ্ধতিটি গঠিত।

সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত শব্দগুলি 'গ্রামালোগ' দিয়ে নির্দেশ করা হয়। লাইনে রাখা বিন্দুটির অর্থ 'দ্য' (the), লাইনের একটু ওপরে রাখা বিন্দুটি হল এ (a), যে শব্দ-বন্ধগুলি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়েছে (এখানে 'ইন দ্য সারকামস্ট্যানসেস'),সেগুলি 'ফ্রেজোগ্রাফ' দিয়ে বোঝানো হয়েছে। ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণগুলির পাশে বিভিন্ন বিন্দু ও রেখা এঁকে স্বরবর্ণের উচ্চারণ বোঝানো হয়েছে। স্বরবর্ণের এই বিন্দুগুলিকে লাইনের বিভিন্ন পাশে রেখে বিভিন্ন শব্দ সৃষ্টি হয়। যেমন ধরা যাক 'tn' শব্দের সংকেত। এই সংকেত লাইনের কিছু ওপরে লেখা হলে tan শব্দ বোঝাবে, লাইনে লেখা হলে বোঝাবে ten, লাইনের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে গেলে হবে tin।

মুখের কথার থেকেও শর্টহ্যাণ্ড আরও দ্রুতবেগে লেখা যায়। বক্তারা সাধারণত মিনিটে গড়ে ১৫০টি শব্দ উচ্চারণ করেন, আর শর্টহ্যাণ্ড ? এক শর্টহ্যাণ্ড-প্রতিযোগিতায় প্রতি মিনিটে ২৫০টি শব্দ লেখা হয়েছিল।

শর্টহ্যাণ্ডের এই লাইনগুলিতে পিটম্যানের পদ্ধতিতে 'তিন অন্ধ ইঁদুর'(থ্রি ব্লাইন্ড মাইস) নামের ছড়াটি লেখা হয়েছে

প্রশ্ন

(১) কোন গ্রহের চারটি উপগ্রহ আছে ? **আলি আফজল**, বীরভূম ।
(২) মারাদোনার সম্পূর্ণ নাম কী ? **কমল সিওয়া**, জলপাইগুড়ি ।
(৩) সুস্থ মানুষের হৃৎপিণ্ড মিনিটে কতবার স্পন্দিত হয় ? **পূর্ণিমা, রানু ও মাসুদ**, বর্ধমান ।
(৪) কেমব্রিজের প্রথম বাঙালি ব্যাংলার কে ? **লিপিকা রায়**, নালিকুল ।
(৫) পোল্যান্ডের পার্লামেন্টকে কী বলা হয় ? **অরিন্দম সুহারিয়া**, দুবরাজপুর ।
(৬) কোস্টা রিকার রাজধানীর নাম কী ? **সংঘমিত্রা ও পার্থসারথি দাস**, বোলপুর ।
(৭) গত বছরের 'ইউরোপিয়ান ফুটবলার অব দ্য ইয়ার' নির্বাচনে কে দ্বিতীয় স্থান পেয়েছিলেন ? **অয়ন রায়চৌধুরী**, আসানসোল ।
(৮) ভারতে যেসব বিদেশী ফুটবলার খেলেছেন, তাঁদের মধ্যে সর্বোচ্চ গোলদাতা কে ? **প্রান্তিক হাজরা**, জগৎবল্লভপুর ।
(৯) আমেরিকার প্রথম পারমাণবিক ডুবোজাহাজের নাম কী ? **শঙ্কর পাল**, বৈদ্যবাটি ।
(১০) ফিকি (Ficci) শব্দের সম্পূর্ণ অর্থ কী ? **শর্মিতা মাইতি**, ঝাড়গ্রাম ।
(১১) 'ক্যাথে প্যাসিফিক' কোন দেশের বিমানসংস্থা ? **চন্দ্রাণী চক্রবর্তী**, খড়্গপুর ।
(১২) ভিয়েতনামের রাজধানীর নাম কী ? **সারণি দাস**, বেহালা ।
(১৩) কলকাতা দূরদর্শনের সম্প্রচার কবে থেকে শুরু হয় ? **ভাস্বতী সরকার**, কোচবিহার ।
(১৪) পেলে কত সালে কলকাতা ময়দানে খেলেছিলেন ? **শঙ্কর পাল**, চন্দননগর ।
(১৫) I.I.T-এর সম্পূর্ণ নাম কী ? **কৃষ্ণা ঘোষ**, ঝাড়গ্রাম ।
(১৬) রাষ্ট্রপুঞ্জের সর্বশেষ সদস্য-রাষ্ট্র কোনটি ? **গৌতম পুরকায়স্থ**, কলকাতা-১২ ।
(১৭) মাদাগাস্কারের রাজধানীর নাম কী ? **শুভ্রজিৎ সেনগুপ্ত**, নন্দীগ্রাম ।
(১৮) জাম্বিয়ার মুদ্রার নাম কী ? **সুগত ঘোষ**, বার্নপুর
(১৯) মারাদোনা, পেলে, লিনেকার ও গুলিটের মধ্যে মিল কোথায় ? **ডোডো দাশগুপ্ত**, কলকাতা-১০ ।
(২০) ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা কে ? **সুজন ভদ্র**, কলকাতা-৪৬ ।

নিল ও'ব্রায়েন

(২১) গৌতম বুদ্ধের প্রথম পাঁচজন শিষ্যের নাম কী ? **ইন্দ্রাণী কুমার**, শেওড়াফুলি ।
(২২) মুঘলযুগে তাম্রমুদ্রার নাম কী ছিল ? **গুঞ্জা মিত্র**, কলকাতা ।
(২৩) ১৯৯০ সালে বিশ্বকাপ ফুটবলের ম্যাসকট 'চিয়াও' । কোন শিল্পী এই চিয়াও-এর পরিকল্পনা করেছিলেন ? **অনীক সাঁই, অতীন সাঁই**, পাল্লা রোড ।
(২৪) কোনতারিখ 'পতাকা-দিবস' ? **রঞ্জন চক্রবর্তী**, ঝাঁপানডাঙা ।

(উত্তর আগামী সংখ্যায়)

গত সংখ্যার উত্তর

(১) হোয়াইট স্টার কম্পানি ।
(২) ব্রোমিনেটেড ভেজিটেবল অয়েল ।
(৩) ইতালির সালভাদর স্কিলাচি ।
(৪) পুরোচন ।
(৫) চিয়াও ।
(৬) সাতটি ।
(৭) হেনরি মিলার ।
(৮) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ।
(৯) ইংল্যান্ডের পিটার শিলটন ।
(১০) ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন ।
(১১) মহারানি ভিক্টোরিয়া ।
(১২) ৬৪টি ।
(১৩) কেরল ।
(১৪) মাইকেল ডুকাকিস ।
(১৫) জুলোতি ।
(১৬) বেলগ্রেড ।
(১৭) ১৯৬০ সালের রোম ওলিম্পিক ।
(১৮) পেসো ।
(১৯) বেবেটো ।
(২০) গোরক্ষপুর ।
(২১) সীতা দেবী ।

স্কিলাচি

হেনরি মিলার

সীতা দেবী

শিলটন

বিষয় : উইলিয়ম শেকসপিয়র

প্রশ্ন

(১) শেকসপিয়রকে কেন 'আভন-এর চারণকবি' (দ্য বার্ড অব আভন) বলা হয় ?
(২) অ্যান হ্যাথাওয়ে কে ছিলেন ?
(৩) শেকসপিয়রের আমলে ইংল্যান্ডের রাজত্ব কার হাতে ন্যস্ত ছিল ?
(৪) শেকসপিয়র সর্বমোট ক'টি নাটক লিখেছিলেন ?
(৫) এলসিনোর দুর্গের পটভূমিতে কোন নাটক লেখা হয়েছিল ?
(৬) কোন নাটকের একটি দৃশ্যে ভোজসভায় প্রেতাত্মা এসেছিল ?

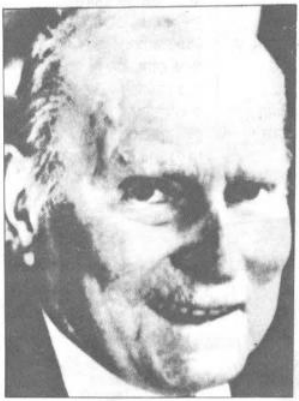

রানি প্রথম এলিজাবেথ

(৭) কোন নাটকে 'মানুষের সাতটি দশা'র কথা বলা হয়েছে ?
(৮) জুলিয়াস সিজারকে কোন চক্রান্তকারী সর্বপ্রথম ছুরি মেরেছিল ?
(৯) শেকসপিয়রের কোন নাটকের গল্প নিয়ে হিন্দি ছবি 'আঙ্গুর' তৈরি হয়েছিল ?

গ্লোব থিয়েটার

(১০) শেকসপিয়রের একটি নাটকের চলচ্চিত্র রূপায়ণে অভিনয় করে সার লরেন্স অলিভিয়ার শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে অকাদেমি পুরস্কার (অস্কার) পেয়েছিলেন। কোন নাটক ?
(১১) 'রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট' নাটকে প্রতিদ্বন্দ্বী দুই পরিবারের নাম কী ছিল ?
(১২) শেকসপিয়রের কোন নাটকে তিনটি অংশ রয়েছে ?
(১৩) ঝগড়াটে, বদমেজাজি ক্যাথারিনাকে শেষ অবধি কে জব্দ করেছিল ?
(১৪) উইলিয়ম শেকসপিয়রের মাঝখানের নামটি কী ছিল ?
(১৫) শেকসপিয়রের কোন নায়িকা বেলমন্ত প্রাসাদে বাস করত ?
(১৬) শেকসপিয়রের নাটকে কোন পুরুষ চরিত্রের সংলাপ সবচেয়ে বেশি ?
(১৭) জুডিথ ও হ্যামনেট কাদের নাম ?
(১৮) কলকাতার মিনার্ভা থিয়েটারের প্রথম প্রযোজনা ছিল গিরিশ ঘোষ অনূদিত শেকসপিয়রের একটি নাটক। কোন নাটক ?
(১৯) গনোরিল, রেগান ও কর্ডেলিয়া কাদের নাম ?
(২০) শেকসপিয়রের আমলে লন্ডনের বিখ্যাত থিয়েটার-হলটির নাম কী ছিল ?
(২১) শেকসপিয়রের আমলে কোন অভিনেতা বেশিরভাগ ট্র্যাজিক নাটকে নায়কের ভূমিকায় রূপদান করেছিলেন ?
(২২) শেকসপিয়রের আমলে সবচেয়ে বিখ্যাত অভিনেত্রীর নাম কী ছিল ?
(২৩) 'বালক চেম্বারলিনের সদস্য' (ল্যাড চেম্বারলিন্‌স মেন) কাদের বলা হত ?
(২৪) শেকসপিয়রের লেখা শেষ নাটক কী ?
(২৫) শেকসপিয়রের উইলে তাঁর স্ত্রীকে একটি বিশেষ আসবাব দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কী সেই আসবাব ?

প্রশ্ন

(ক) বেন হুর ছবির অভিনেতা চার্লটন হেস্টন শেকসপিয়রের এক নাটকে অভিনয় করছেন। কোন নাটক ?
(খ) শেকসপিয়রকে নিয়ে এই জাদুঘরটি কোথায় অবস্থিত ?
(গ) ১৯৮৯ সালের ১১ জুলাই পরলোকে গমন করেছেন এই বিখ্যাত অভিনেতা। ইনি কে ?

(ক)

(গ)

(খ)

ছবির পরিচয় : (ক) ম্যাকবেথ। (খ) স্ট্যাটফোর্ড-অন-আভন। (গ) সার লরেন্স অলিভিয়ার।

উত্তর : (১) শেকসপিয়র 'স্ট্যাটফোর্ড-অন-আভন' গ্রামে জন্মেছিলেন। (২) শেকসপিয়রের স্ত্রী। তিনি শেকসপিয়রের চেয়ে আট বছরের বড় ছিলেন। (৩) শেকসপিয়রের জীবদ্দশায় দু'জন মানুষ ক্রমান্বয়ে ইংল্যান্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। রানি প্রথম এলিজাবেথ ও রাজা প্রথম জেমস। (৪) ৩৮টি। (৫) হ্যামলেট। (৬) ম্যাকবেথ। (৭) অ্যাজ ইউ লাইক ইট। (৮) কাসকা। (৯) এ কমেডি অব এররস। (১০) হ্যামলেট। (১১) মন্তাগু ও ক্যাপুলেট। (১২) হেনরি সিক্সথ। (১৩) পেত্রুসিও। (১৪) এখনও জানা যায়নি। (১৫) 'দ্য মার্চেন্ট অব ভেনিস' নাটকের নায়িকা পোর্সিয়া। (১৬) হ্যামলেট। (১৭) শেকসপিয়রের দুই সন্তান। (১৮) ম্যাকবেথ। নাটকটি আদৌ জনপ্রিয় হয়নি। গিরিশ ঘোষের মতে, "দর্শকরা শুধু নাচ-গান ছাড়া আর কিছুই চাননি।" (১৯) রাজা লিয়রের তিন কন্যা। (২০) গ্লোব থিয়েটার। (২১) রিচার্ড বার্বেজ। (২২) কোনও অভিনেত্রী ছিল না। পুরুষরাই নারী-চরিত্রে রূপদান করত। (২৩) লন্ডনের এক বিখ্যাত থিয়েটার-কম্পানির নাম। শেকসপিয়র ওই দলের সদস্য ছিলেন। (২৪) দ্য টেম্পেস্ট। (২৫) তাঁর প্রিয় বিছানা।

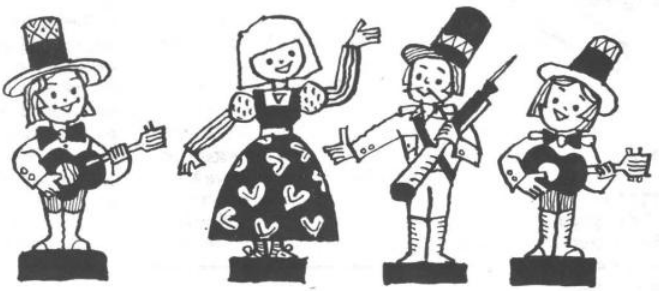

ফুটবলের নানা ঘটনা

ফুটবল এখন পৃথিবীর প্রতিটি দেশেই জনপ্রিয় খেলা। তাকে ঘিরে মানুষের উন্মাদনার সীমা-পরিসীমা নেই। ফুটবলের নিয়মকানুন, ইতিহাস, বিশ্বকাপ আর ওলিম্পিকে নানা ব্যক্তি ও দলের সাফল্যের বিস্তারিত খবরাখবর—এইসব নিয়ে দেশে-বিদেশে কত বই-ই প্রকাশিত হয়। কিন্তু অ্যানড্রু ব্রাউনের লেখা 'সকারস স্ট্রেনজেস্ট ম্যাচেস' (ইকুয়েশন প্রকাশনা/দাম : ১০·৯৫ পাউন্ড) একেবারে অন্য ধরনের বই। নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে, ফুটবল মাঠে যেসব উদ্ভট ঘটনা ঘটেছে তার সঙ্কলন। পড়ে সত্যিই তাক লেগে যায়। ছবিগুলিও দারুণ। কোন টিম কত সালে তাদের দলের খেলার মান উন্নত করতে সঙ্গে এনেছিল একজন হিপ্‌নোটিস্টকে ? কোন দল সর্বদা মুখোশ পরে ম্যাচ খেলত ? ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে পেছন থেকে বাড়ানো পাস ধরতে গিয়ে কোন দলের খেলোয়াড় শেফিল্ডের খালের জলে পড়ে গিয়েছিল ? কোন ম্যাচে, কোন খেলোয়াড়ের ওপর বজ্রপাত হয়েছিল ? এক প্রত্যক্ষদর্শীর মতে, বাজ পড়েছিল নাকি রেফারির ফ্রি-কিকের বাঁশির সঙ্গে সুর মিলিয়ে !

এ-সমস্ত প্রশ্নের উত্তর তো আছেই, সেইসঙ্গে বইটিতে আছে অবাক করবার মতো আরও হাজার প্রসঙ্গ।

খেলনার দোকান

লন্ডন থেকে একটু দূরে শহরতলি অঞ্চলে ছিল এক খেলনার দোকান। নানারকম খেলাধুলোর সরঞ্জাম, পুতুল, ইলেকট্রনিক খেলনা—সব কিছুই সে দোকানে পাওয়া যায়। দোকানটার একটা অদ্ভুত বিশেষত্বও আছে। রাত্রিবেলা, দোকান বন্ধ করে সকলে চলে যাওয়ার পর ওইসব পুতুল আর খেলনা জ্যান্ত হয়ে ওঠে। তখন তারা একে অন্যের সঙ্গে কথা বলে, গল্প করে, গান গায়।

এইভাবে এক টিনের সৈনিক-পুতুলের সঙ্গে খুব ভাব হল এক সোনালি চুলওলা নর্তকী-পুতুলের। আর ছিল তাদের দু'জনের বন্ধু টুপিপরা গিটার-বাজিয়ে পুতুল। তাদের জীবনের অনেক আনন্দ-দুঃখভরা ঘটনা আর অভিজ্ঞতার কাহিনী, 'দ্য ম্যাজিক টয় শপ'। বইটির লেখক পিটার সিমুর। কলিন্‌স প্রকাশন সংস্থা বইটি প্রকাশ করেছেন। ছবি এঁকেছেন মাইকেল ওয়েপলি।

দাম : ৭·৯৫ পাউন্ড।

রূপকথা ও গোয়েন্দা গল্প

পুরীতে মারুতি
প্রতিভা বসু
প্রত্যয় প্রকাশনী,
কলকাতা-৭০০ ০০৯
দাম : ১৫ টাকা

প্রতিভা বসুর লেখা 'পুরীতে মারুতি' কিশোরদের মনকাড়া রহস্য উপন্যাস। একবার পড়তে শুরু করলে শেষ না করে উপায় নেই। প্রখ্যাত লেখিকার গোয়েন্দাকাহিনীর নিখুঁত বুনট ও সাবলীল ভাষার প্রবাহ বড়দেরও আকর্ষণ করে। কিশোর অঙ্কুর ঠাকুমা হৈমন্তীর সঙ্গে পুরী ভ্রমণ এবং বিভূপ্রসাদ আচার্যের হত্যারহস্য ও তার সমাধানের কাহিনী সুন্দরভাবে বিন্যস্ত হয়েছে। কিশোর মনের ভালবাসা ও সাহসী, সন্ধিৎসু মনের ভাবনা চমৎকার ফুটেছে।

প্রত্যুষপ্রসূন ঘোষ

শুধু রূপকথা নয়
হীরেন চট্টোপাধ্যায়
সাহা বুক স্টল, কলকাতা-৭০০০৭৩
দাম : ১২ টাকা

'গভীর জলের দানব', 'কেশবতী কন্যা', 'ঘুমন্ত দানব', 'চাঁদের মূর্তি' ও 'বাচ্চু'—এই পাঁচটি গল্পের সঙ্কলন 'শুধু রূপকথা নয়'। ছোটদের এই গল্পগুলি সুন্দর।

হিমাংশু জানা

কিশোর রহস্য অমনিবাস
পার্থ চট্টোপাধ্যায়
পুনশ্চ কলকাতা-১০
দাম : ৩৫ টাকা

বাংলা রহস্য-গল্পের ঐতিহ্য সব দিক দিয়েই বিশেষ সমৃদ্ধ। হেমেন্দ্রকুমার রায় থেকে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বা সত্যজিৎ রায় থেকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বা সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ সকলের রহস্য গল্প-উপন্যাসই পাঠককে আবিষ্ট করে রাখে। পার্থ চট্টোপাধ্যায় কুশলী সাংবাদিক হলেও তাঁর রহস্য-রচনাও যে কত সুন্দর, তা টের পাওয়া যায় আলোচ্য গ্রন্থখানি পড়লে। কাহিনীর টানটান গতি সাসপেন্স এবং চরিত্র-চিত্রণের স্বাভাবিকতায় প্রতিটি উপন্যাসই হয়ে ওঠে রহস্য-রোমাঞ্চের অসামান্য বিশ্বস্ত প্রতিফলন।

গৌতম ঘোষদস্তিদার

ছেলেধরার হাতে

বাচ্চা ছেলে রজার খেলতে গেছে পার্কে। বিকেলবেলা। ফেরার সময় হঠাৎ তার নাকে ক্লোরোফর্ম চেপে ধরে কারা যেন তুলে নিল গাড়িতে। জ্ঞান ফেরার পর রজার দেখল, তাকে ধরে এনেছে এক গুণ্ডার দল। শহর থেকে দূরে এক ভাঙাচোরা কেল্লার মধ্যে রজারকে বেঁধে রাখা হল। যতদিন না তার বাবার কাছ থেকে মুক্তিপণ আদায় করা যায় ততদিন রজারকে এভাবে বেঁধে রাখা হবে। দুপুরবেলা গুণ্ডারা তাদের দুই সঙ্গীকে রেখে বেরিয়ে গেল কেল্লা থেকে। রজার সেই ফাঁকে নানারকম বুদ্ধি খাটিয়ে পালাল দুষ্টু লোকেদের খপ্পর থেকে। কিন্তু বাড়ি ফিরবে কী করে রজার ? সে যে রাস্তা চেনে না ! ওদিকে গুণ্ডারাও বেরিয়েছে তাকে খুঁজতে। শেষ পর্যন্ত কী হল জানা যাবে, 'জলি রজার অ্যাণ্ড দ্য পাইরেটস অব আবদুল দ্য স্কিন হেড' বইটিতে। লিখেছেন কলিন নাউটন। প্রকাশক : ওয়াকার সংস্থা। দাম : ৮·৯৫ পাউণ্ড। পাতায়-পাতায় উৎকণ্ঠা আর উত্তেজনা। এক নিশ্বাসে বইটি পড়ে ফেলা যায়।

অভীক মজুমদার

ছবি : দেবাশিস দেব

নানারকম

ধাঁধা

"অনেকদিন সতুবাবুকে ক্লাসিক ধাঁধা দেওয়া হয়নি। তাই না, সতুবাবু ?" ধাঁধার খাতাটার পাতা ওলটাতে-ওলটাতে বলল ছোট্কা।
কাগজ-পেনসিল নিয়ে আমি অনেকক্ষণ ধরে তৈরি। প্রথমে ভাবলাম, নতুন কোনও ধাঁধাই দিচ্ছে ছোট্কা। লিখতে যাব, এমন সময় ঠাহর হল, ধাঁধা নয়, একটা প্রশ্ন সরাসরি আমাকেই করেছে ছোট্কা। প্রশ্নটা শুনে একটুক্ষণ চুপ করে থাকি আমি। তারপর একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ে যেতেই বলে উঠি,
"সত্যি-মিথ্যের একটা ধাঁধা দেবে ছোট্কা ? ওগুলো পুরনো হলেও বারবার নতুন লাগে।"
"ওটাই তো ক্লাসিকের মজা।" ছোট্কার ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটল। বলল, "সাহিত্যই হোক, কি ধাঁধা, ক্লাসিক মানেই বারেবারে নতুন করে পাওয়া। বেশ, তা হলে তেমনই একটা ধাঁধা লিখে নাও।"
লিখে নিলাম তক্ষুনি। সেটা দিয়েই শুরু এবার।

প্রথম ধাঁধা ॥ দুই যমজ ভাই। চেহারা হুবহু একরকম, শুধু স্বভাব আলাদা। একজন সব সময় সত্যি কথা বলে, অন্যজন সব সময় বলে মিথ্যে কথা।
এই দুই ভাই বসে থাকে অতি গুরুত্বপূর্ণ এক তে-রাস্তার মোড়ে। শহর থেকে সোজা এসেছে একটি পথ। এর পর একটি রাস্তা গিয়েছে অন্য শহরের দিকে, আর-একটি, বিপদসঙ্কুল জঙ্গলের দিকে। নতুন লোকেরা ওই মোড়ে এসে জানতে চায়, কোন রাস্তা শহরের দিকে গিয়েছে। কখনও উত্তর দেয় সত্যবাদী। কখনও জবাব দেয় মিথ্যেবাদী ভাই। ফলে, কেউ ঠিক রাস্তা পেয়ে শহরে পৌঁছয়, কেউ বনের ভেতরে যেতে বাধ্য হয়। আরও মজা হল, একটির বেশি দুটি প্রশ্নের জবাব দেবে না দুই ভাই। হল কী, একবার এক দারুণ তুখোড় ভদ্রলোক ওই মোড়ে এলেন গাড়ি নিয়ে। তিনি এই ছেলে দুটির স্বভাবের কথা আগেই শুনেছেন। এরা যে একটিমাত্র প্রশ্নেরই উত্তর দেয়, এদের মধ্যে কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যেবাদী বাইরে থেকে যে বোঝার জো নেই, সবই জানা ছিল বুদ্ধিমান ভদ্রলোকের। ফলে, তিনি ভেবেচিন্তেই প্রশ্ন তৈরি করে এসেছিলেন। একটিমাত্র প্রশ্ন তিনি করলেন দু' ভাইয়ের একজনকে। আর, কী আশ্চর্য ব্যাপার, সেই উত্তরের ভিত্তিতে দিব্যি বুঝে গেলেন কোনটি শহরের রাস্তা। এবার বলো তো, ভদ্রলোকের প্রশ্নটি কী ছিল, কীভাবেই বা সঠিক পথ আন্দাজ করলেন তিনি ?
দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ কোন বাস চড়ার নয়, পড়ার ?
তৃতীয় ধাঁধা ॥ জট ছাড়াও—

হিকাশিনীকার

গতবারের উত্তর ॥ (১) সেজোদাদুর বয়স ৫০। (২) Deny। (৩) ঘোড়ার প্রতিশব্দ হয়। হাতির ?

সত্যসন্ধ

মজার খেলা

নাম, মজার খেলা। আসলে কিন্তু এবারের এই খেলাটা মজাদার এক ম্যাজিক। ঠিকমতো দেখাতে পারলে, বন্ধুরা একেবারে থ হয়ে যাবে। সুকুমার রায়ের কবিতায় সেই-যে কী যেন বলে, খাচ্ছে কিন্তু গিলছে না, অনেকটা সেইরকমই তাজ্জব ব্যাপার। ঢালছি তবু পড়ছে না।
ওহো, কী ঢালছি আর কী পড়ছে না, সেটাই তো বলা হয়নি এখনও। কী দিয়ে বা কী-কী দিয়ে খেলাটা হবে, তাও উহ্য রয়ে গেছে। প্রথম থেকেই বলি তা হলে।
এ-খেলার জন্য লাগবে কাঠিভর্তি একটি দেশলাই বাক্স। এইমাত্র, আর কিছু না। আর-একটু প্রস্তুতি লাগবে অবশ্য, সে-কথায় আসছি পরে। তার আগে বলো তো, কাঠিভর্তি এই দেশলাই বাক্সটাকে টেবিলের ওপর উলটো করে যদি ধরি, তারপর ভেতরের ড্রয়ারটাকে বাইরে টেনে আনি বাক্সটার উলটো করেই-ধরে-থাকা অবস্থায়, তা হলে কী হবে ?
তুমিও জানো, আমিও জানি। ঝুরঝুর করে দেশলাই কাঠি ছড়িয়ে যাবে টেবিলের ওপর। আমাদের এবারের খেলাটা এ-ব্যাপারটাকেই কেন্দ্র করে। যা বললাম, তাই করব, কিন্তু একটি কাঠিও টেবিলে পড়বে না। ভাবছ

তো, ফাঁকা দেশলাইবাক্স দিয়ে খেলাটা হবে। তা মোটেও নয়। খেলাটা দেখিয়ে বন্ধুদের অবাক করে দেওয়ার পর, তুমি আবার দেশলাইকাঠিভর্তি ড্রয়ারটাকে উলটো করে ধরে দেখাবে, কাঠিগুলো ঝুরঝুর করে সেবার টেবিলে ছড়িয়ে যাচ্ছে।
তা হলে প্রথমবার ম্যাজিকটা দেখানো যাবে কী করে ? খুব সোজা। খেলা দেখাবার আগে একটা কাঠিকে মাপমতো ভেঙে দেশলাইবাক্সের খোলের ওপর মাঝ বরাবর আঁট করে লাগিয়ে দাও।
এর পর তো দারুণ সহজ। যতই উলটো করে রাখো, খোলো, কাঠিগুলো পড়বে না। আর খেলাটা দেখে, বন্ধুরা যখন হতবাক, চট করে একটা আঙুল দিয়ে মধ্যের কাঠিটাকে নাড়িয়ে সোজা করে দাও। সব কাঠি তক্ষুনি ঝুরঝুর করে টেবিলে পড়ে যাবে। ভাঙা কাঠিটাও। কিন্তু সেটাকে আলাদা করে চেনা যাবে না তখন।

মজারু

কত কথা

প্রথমে চারটি তিন অক্ষরের শব্দ দেওয়া হল। এই শব্দগুলোর একটা করে অক্ষর পালটে অন্য অক্ষর বসালে চারটে ফুলের নাম পাওয়া যাবে :
(ক) আনন্দ। (খ) নগর। (গ) চম্পট। (ঘ) গোসাপ।

২। 'কবচকুণ্ডল'—এই শব্দের মধ্যে পর-পর মোট ক'টি এবং কী-কী শব্দ পাওয়া যাবে ?
৩। কোন মাস শুরুতেও যা, শেষেও তাই ?

উত্তর : ১। (ক) আকন্দ। (খ) টগর। (গ) চম্পক। (ঘ) গোলাপ। ২। মোট পাঁচটি—কবচ, বচ, কু, কুণ্ড, কুণ্ডল। ৩। সমাস (শুরুতেও স, শেষেও স)।

কথক

রিল্যাক্সনের খুশি আনন্দ রাশি রাশি

সারারাত রিল্যাক্সনের বিছানায় চমৎকার ঘুম।
তারফলে সারাদিন চনমনে, তাজা, হুটোপাটি আর হরেক মজা।
রিল্যাক্সনের এইতো জাদু। রিল্যাক্সন রাবারাইজ্‌ড কয়ার ম্যাট্রেস
বিজ্ঞানসম্মতভাবে শরীরের ভার বহন করে।
এতে শুধু ঘুমই নয়, হয় সত্যিকারের বিশ্রাম।
রিল্যাক্সনের ছোঁয়ায় খুশিতে ভরে উঠুক সারাদিন।

Subhagya/RIL—3/90/BEN

RILAXON

আপনার আরামের জন্য

গদী • তাকিয়া • বালিশ

শ্রী দিগ্বিজয় সিমেন্ট কোম্পানী লিমিটেডের
'কয়ার ও ফোম' ডিভিশন
১৪, নেতাজী সুভাষ রোড কলকাতা-৭০০ ০০১

ISI 8391:1977

ANANDAMELA 22 AUGUST 1990 REGD.NO
WB/CC/264 MH BY SOUTH 683 TN/MS(C) 731

মাসিডিজ-এ পরিবর্তনের এটাই সময়

ঈগল। সেই কোম্পানী যা ভারতবর্ষে ক্যাসেরোলের চিন্তা প্রথম এনেছিল। এরাই এবার আপনাদের দিচ্ছে মাসিডিজ, যাতে আছে চরম উৎকর্ষের ছোঁয়া। মাসিডিজ। এমনকী জার্মানরাও এতে গর্বিত হবেন।

মাসিডিজের স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত আকারে পাচ্ছেন মনোরম রঙ ও অনুপম নকশার বাহার। আপনার পছন্দের জন্য আছে তিনটি সাইজ, যাদেরকে একের ওপর এক থাকথাক সাজিয়েও রাখা যায়।

মাসিডিজের ট্রিপল লকিং ঢাকনা খুলুন, দেখতে পাবেন বিচ্ছেদযোগ্য দুটি স্টেনলেস স্টীলের ইনার, যাতে দুরকমের ডিশ ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাতেগরম থাকে। কারণ হ'ল মাসিডিজের পেটেন্ট করা অপরিবাহী পলিইনসুলাক্স®। এই ইনারগুলো সাফসাফাই রাখাও খুব সহজ।

মাসিডিজ— ঈগলের উপহার। তাপের অপরিবাহিতার জগতে ৩৩ বছরেরও বেশী অভিজ্ঞতার বিশ্বস্ত নাম এবং সারা বিশ্বের ৬৪টি দেশের কোটি কোটি পরিতৃপ্ত ক্রেতাদের যা প্রত্যাশা, ঠিক তাই।

ঈগল ফ্লাস্ক ইণ্ডাস্ট্রীজ লি.

ঈগল এস্টেট, অলেগাঁও ৪১০৫০৭, জিলা পুনে, মহারাস্ট্র। ঈগল আপনার অনেক কাজে আসবে।

DART/EF/2040/BEN